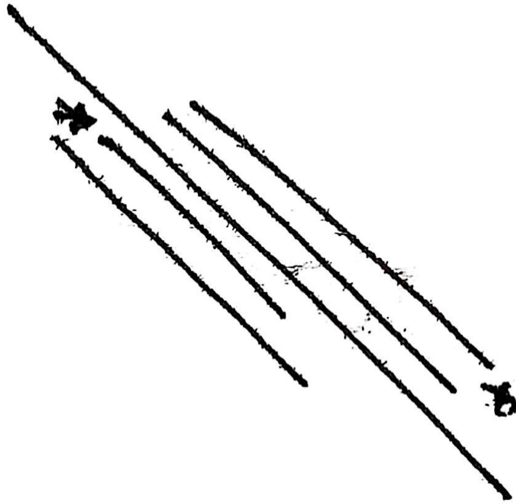
আমার জীবনের সত্য কথা

— মোঃ মনিরুজ্জামান

স্বরচিত: পুস্তক নং ১

আমার জীবনের সত্য কথা

—মো: মনিরুজ্জামান (মনি)



স্বরচিত বই নং ১

মনজুর প্রকাশনী

বাধাঁই, প্রচ্ছদ এবং বুক নির্মান :-
মো: মনিরুজ্জামান (মনির)

প্রথম প্রকাশ :- ৩০শে আগষ্ট
১৯৯৭।

মূল্য :- হাতের লেখা বিনামূল্যে
নেবেন তবে দলে দলে।
হবে না ভাই হবে না
দেব না ভাই দেব না।

* ভূমিকা *

অবশেষে অনেক কষ্ট সহ্যের পর "আমার জীবনের সত্য কথা" বইটি বের করতে সমর্থ্য হলাম। সঙ্গত কারণে বইটি প্রথম সুন্দর হাতের লেখার মাধ্যমে বের করলাম। লেখার বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয় তাহলে আমাকে মাপ করে দেবেন।

এই বইটি লেখার পিছনে আমার সময় পার হয়েছে ৩০ ঘন্টা। তবে এক নাগাড়ে নয়। এই স্বল্প সময়ে আমাকে লিখতে হয়েছে ৬৫ দিনের ঘন্টা। আর এই বইটি লেখার সময়

আমার বয়স ১৬ বছর এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এই বইটি পড়ার আমন্ত্রন জানিয়ে ভূমিকা এখানেই শেষ করছি।

— মো: মনিরুজ্জামান
(লেখক)
৩০-৮-৯১

বি:দ্র:- এই লেখাটিতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। কারন, আমি কোন লেখক নই। বিখ্যাত লেখকের মতো লিখতেও পারি না।

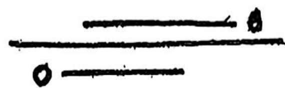
[illegible]

[illegible]

[illegible]

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর।
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী।
দাও সে তপোবন পূণ্য ছায়া রাশি—

— অজ্ঞাত



যদি বাঁচার মত বাঁচতে চাও
তবে বেশী করে গাছ লাগাও।

— অমিয়

বিঃ দ্রঃ— লেখায় বহু ভুল-ত্রুটি হয়েছে বলে
ক্ষমা চাই।

৭৮৬

পৃথিবীর কথা বাদই দিলাম। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হয়ে এ দেশ সম্পর্কে আমরা ~~এ দেশ সম্পর্কে~~ যে কতটুকুই বা জানি। এ দেশ সম্পর্কে জানার হয়তো কারও ইচ্ছা আছে, হয়তো নাই। কারও আবার ইচ্ছা আছে সুযোগ নাই। হয়তো কারও ইচ্ছা ও সুযোগ দুটোই আছে। আমার এই দেশ সম্পর্কে জানার একটা তীব্র ইচ্ছা ছিল এবং আছে। কিন্তু সুযোগ পাইনি কোন দিন। আমি সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার আশা ছিল একদিন আমি ঠিকই সুযোগ পেয়ে যাব। আমার এই আশা প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল বলেই একদিন এই আশা সত্যিতে রূপান্তরিত হলো। অর্থাৎ আমি এ দেশ সম্পর্কে জানার একটা

* আমার জীবনের আত্মকথা *

সুযোগ পেয়ে গেলাম। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বলে আমি সুযোগ পাওয়ার আগে আগেই সিদ্ধান্ত নিলাম। জানি না আমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল হয়েছিল। হয়তো ভুল নয়তো নির্ভুল। থাক আর ভূমিকা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। কারন ভূমিকা দিয়ে তো আর লেখাটা শেষ করতে পারবো না। ভূমিকার সাথে দরকার বিস্তারিত বিবরনেরও। দেখি এমন কিছু বিবরন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি কিনা, যাতে আপনারা একটু আনন্দ পেতে পারেন। কোন ত্রুটি হলে বিশেষ করে লেখার বিষয়ে তাহলে মাফ করে দেবেন। কারন আমি কোন কবি নই যে, ভাল-ভাবে নিজের ভাব লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো। এবার তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে মূল ঘটনা শুরু করি।

সেদিন ছিলো ২৭-ই জুলাই ১৯৮৭।

* আমার জীবনের সত্য কথা *

সকাল বেলা হতেই দিনটা আমার দামী ছিল। সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠলাম। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে রীতি মতো পড়তেও বসলাম। কিন্তু পড়ায় মোটেও মন বসছিলো না। মাথায় পূর্বের সেই চিন্তাটি বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঘুরপাক খেতে খেতে চিন্তাটি এক সময় এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো যে, সেখান থেকে চিন্তাটাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো আজই আমার সেই আশাটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। আমি এর জন্য সম্ভব সব রকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। তারপর কয়েকটা ঘন্টা আমার নিজের অজান্তে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল। একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি, যখন এই ঘটনার শুরু হয় তখন

*আমার জীবনের সত্য কথা *

আমি পিতা-মাতা সহ খাওয়া দাদের বাস করি। আর তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর এবং ৮ম শ্রেনীর ছাত্র। এখন স্কুল থেকে আবার ফিরে আসা যাক।

স্কুল সেদিন কি কারনে যেন বন্ধ ছিল। বেলা তখন আনুমানিক ১২-৩০টা। সম্ভবত আমার দেশ দেখার বা ভ্রমনের কোন কারনে না) আমি আমার পড়ার রুমে ঢুকেছিলাম। আমার পড়ার রুমেই ছিল আমাদের পরিবারের একটা আলমারি। আমি জানতাম ঐ আলমারিতে প্রায়ই টাকা থাকে। সম্ভবত কারনেই আমার নজর আলমারির উপর পড়লো। আলমারির দিকে চেয়ে দেখি আলমারি খোলা। আমি আস্তে বুক বেঁধে আলমারির আরও কাছে গেলাম আল্লাহ আমার প্রতি সহায় হলেন। দেখলাম অনেক টাকা। আনুমানিক ১৯০০-২২০০। আমার বুকের

* আমার জীবনের সত্য কথা *

ভিতর তখন প্রাচীন দিল্লীর রাজ-প্রাসাদের খুঁজা খোঁজা শুরু করে দিয়েছে। আমি বেশী দেরী না করে ওখান থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে পকেটে ঢুকলাম। তারপর আলমারির দরজা দুটো ভেজিয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসলাম। ~~তারপর~~ একটা বই খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলাম। মন দিয়ে পড়া যে না। একেবারে শুধু লোক দেখান পড়া। মা-বাবা যাতে সন্দেহ না করে তার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিছুক্ষন পর যখন ভাবলাম এখন আর আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না তখন টেবিল থেকে উঠলাম।

আমরা ছিলাম তিন ভাই। বাবা শখ করে আমাদের তিন ভাইকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। পরিবারের বড় ছেলে বলে সাইকেলটা উপর

আমারই বেশী অগ্রাধীকার ছিলো। সাইকেলের চাবীটা সব সময় আমার কাছেই থাকতো। সাইকেলের চাবীটা নিয়ে সদর দরজার কাছে এলাম। সদর দর-জায় এসে দেখি বাবা চেয়ারে বসে রয়েছেন। আমি মনে মনে যাই সন্দেহ করেছিলাম তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আমাকে বললেন, " এই ভর দুপুরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?"
আমি উনার উত্তরে বললাম, " কোথাও না, এই দীপু-দের বাসায়। দীপুর সাথে আমার কিছু কথা আছে।"
ভেবলাম বাবা তারপর আরও কিছু প্রশ্ন করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। আমিও কোন মতে বেঁচে গেলাম চাবীটা দিয়ে সাইকেলটা খুলে বাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম। আমাদের বাসাটা ছিল তখন কালের পাড়ায় যখন আমি বাসা থেকে বের হলাম তখন আমার

* আমার জীবনের সত্য কথা *

সম্বল ছিলো :- একটা লুঙ্গি, এক জোড়া স্যান্ডেল, একটি ফুল সার্ট, ৩০০ টাকা, একটি ঘড়ি আর একটি হিরো রয়্যাল সাইকেল। অর্থাৎ সর্বমোট যার মূল্য হতে পারে ২৫০০ টাকা। কালের পাড়া থেকে প্রথমে সাইকেল চালিয়ে ভায়না মোড়ে এলাম। দীপুদের বাসাটা ছিল থানা পাড়ায়। আমার এই বিদায় বেলায় দীপুকে দেখতে খুবই ইচ্ছা করছিল। কারন দীপু আমার বন্ধুদের ভিতর সবচেয়ে প্রিয়। তাই দীপুদের বাসার দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু দূর্ভাগ্য আমার দীপুদের বাসায় পৌঁছে শুনি দীপু বাসায় নাই। কি একটা কাজে বাইরে গেছে। অগত্যা ওর সাথে দেখা না করেই আমাকে বিদায় নিতে হলো। আমি ঝাউড়া শহরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশ ভ্রমনে বের হয়ে পড়লাম।

মাগুরা শহর হতে দুইটি বড় শহরের দিকে যাওয়া যায়। একটি হলো খুলনা, অপরটি হলো ঢাকা। যেহেতু ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, সেহেতু ঢাকার উদ্দেশ্যেই রওনা হলাম। সাইকেল চালিয়ে ঢাকা রোডে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু ঢাকা রোড থেকে গাড়িতে চড়লাম না। কারন এখান থেকে গাড়িতে চড়লে হয়তো পরিচিত কেউ দেখে ফেলবে। তাই ঢাকা রোড হতে আরও উত্তরে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে থেমে বাসের উদ্দেশ্যে হাত ও তুলেছি। কিন্তু কোন বাসই থামিনি। তাই বাসের উপর এক রকম রাগ করেই বাসের উদ্দেশ্যে আর হাত তুললাম না। এক মনে সাইকেলে প্যাডেল দিতে লাগলাম। প্যাডেল দিতে দিতে প্রায় ৫/৬ মাইল এসে গেছি। আর কিছুদূর পরেই কামারখালী ফেরী ঘাট। তাই আরও জোরে জোরে সাইকেল

* আমার জীবনের সত্যকথা *

প্যাডেল দিতে লাগলাম। ঘন ঘন প্যাডেল দিতে দিতে এক সময় কামারখালি পৌঁছে গেলাম। এবার একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কারন এবার নিশ্চই বাস পাব। সাইকেল নিয়ে ঘাটে ভিড়ানো একটা ফেরীতে চড়ে বসলাম। কিছুক্ষন পর একের পর এক বাস ফেরীতে উঠতে লাগল। মনের মত একটা বাস পেয়ে ফরিদপুরে যাবার ভাড়া ঠিক করে তাতে চড়ে বসলাম। আমি দেখলাম আমার যত ভাড়া লেগেছে সাইকেলেরও তত ভাড়া লেগেছে। এই প্রথম বারের মতো আমি বুঝতে পারলাম সাই-কেলটা আমার জন্য অতিরিক্ত বোঝা। বাসের আরামদায়ক সিটে বসে চলে এলাম ফরিদপুরে। বেলা তখন ৩টা। ফরিদপুরে কিছু খেয়ে-দেয়ে

মিনিবাস থেকে চলে এলাম দৌলদিয়া ফেরী ঘাট। মিনি বাস থেকে নামার সময় গাড়ির হেলপার আমাকে বললেন, " ওদিকে যাবেন না।"

আমি বললাম, " কেন?"

- " ফেরীতে পুলিশ রয়েছে। তারা চোরাই মাল ধরছে। আপনার সাইকেল যেহেতু ভারতের সেহেতু আপনাকে ধরতে পারে।"

আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম। তবুও সচক্ষে দেখার জন্য ফেরী ঘাটেও গেলাম। গিয়ে দেখি সত্যি তাই। পুলিশ সেখানে রয়েছে। এক একটা গাড়ি ফেরীতে উঠছে আর পুলিশ গাড়ির ভিতর বসা ~~পুলিশদের ও~~ যাত্রিদের চেক করছে। সুতরাং আমি আর ওদিকে পা না বাড়িয়ে যে দিক থেকে এসে ছিলাম, সে দিকে রওনা হলাম। আর ভাবতে

লাগলাম, এখন উপায় হবে কি? নৌকায় হয়তো নদীটা পার হতে পারবো। কিন্তু সাইকেল শুদ্ধ নৌকায় নেবে তো। তার উপর আবার ভারতের সাইকেল। যদিও এ দেশে ভাড়া নিশ্চয়ই বেশী চাইবে। এই সব আবল-তাবল কথা ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলাম। আগে অবশ্য নৌকার মাঝিদেরকে জিজ্ঞেস করতেও দ্বিধাবোধ করিনি। কিন্তু তারা কেউ উপায়ে যেতে চাইলো না। তাই আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিলাম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন বাসস্ট্যান্ডে এলাম তখন দেখলাম কিছু দূরে একটা লঞ্চ রয়েছে। লঞ্চটা নদীর তীরে ভিড়ানো। লোকজন অনেকেই সেই লঞ্চের দিকে যাচ্ছে। আমি শেষ চেষ্টা নেবার জন্য লঞ্চের দিকে গেলাম। আল্লাহ এবার আমার প্রতি সহায় হলেন। আমি লঞ্চে চড়ার

সুযোগ পেলাম। কিন্তু ভাড়া চাইলো ডবল। কারন নিশ্চই আপনারা জানেন। সাইকেলের জন্য। করার কিছুই নাই, তাই ভাড়া ডবল দিয়েই রওনা দিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। লঞ্চ তার গতিতে গন্তব্য স্থান অর্থাৎ আরিচা ঘাটের উদ্দেশ্যে চলতে লাগল। লোক মুখে জানতে পারলাম আরিচা ঘাটে যেতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগবে। তাই কম হলেও কিছু সময় হাতে পেলাম। আর সুন্দর পূর্ন গোল একটা চাঁদ উঠেছে। লঞ্চ থেকে চাঁদটাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলো নদীতে পড়ায় নদীটাকেও সুন্দর লাগছিল। চাঁদ সম্পর্কে এ রকম অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম হলো। চাঁদ যে এত সুন্দর হতে পারে তা আগে আমার জানা ছিল না। আমার মনে

হলো চাঁদ আমাকে, আমায় এই ভ্রমণে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় হঠাৎ আমার বাসার কথা মনে পড়ে গেলো। বাবা এতক্ষণে হয়তো খোঁজা-খুঁজি শুরু করে দিয়েছেন। হয়তো মা বাসায় বসে আলোচনা করছেন আমি ওনার কাছে ফিরে যাব। বাবা হয়তো কতক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর বাড়ি ফিরছেন। ওনার আশা, ফিরেই হয়তো দেখতে পাবেন আমাকে। যখন দেখবেন আমি বাসায় নেই, তখন হয়তো খুবই চিন্তিত হয়ে পড়বেন। মা হয়তো এতক্ষণে কান্না-কাটিও শুরু করে দিয়েছেন। আর ভাবতে পারলাম না। বলতে গেলে ইচ্ছা করেই ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম। এই সব চিন্তা করলে হয়তো

আমার দেশ ভ্রমন আনন্দ-দায়ক হবে না।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল পুরো একটা ঘন্টা। টেরও পেলাম না, এই সময়টা কোথা হতে হাওয়া হয়ে গেল। লঞ্চ আরিচা ঘাটে থামলো। মনে মনে খুশী বোধ করতে লাগলাম। কারন শেষ পর্যন্ত আরিচা ঘাটে পৌছাঁতে পারলাম। সাইকেল নিয়ে লঞ্চ থেকে নামলাম। তারপর চলে এলাম আরিচা বাস ষ্ট্যান্ডে। সেখান থেকে একটা মিনি বাসে চড়ে চলে এলাম গাবতলী। মিনি বাসটিও আমার কাছ থেকে ডবল ভাড়া নিল।

গাবতলী যখন পৌছুঁলাম তখন সময় রাত ৯ টা। সাইকেল চালিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম একটা চার তলা হোটেল। আমি সাইকেল নিচে তালা দিয়ে রেখে, দোতলায় গিয়ে হোটেল

ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, " এখানে কি রাত্রে থাকার কোন ব্যবস্থা আছে ?"
- তিনি বললেন, " আছে।"
- " সাথে সাইকেল রয়েছে।"
- " অসুবিধা নেই।"
- " এক রুম কত।"
- " ৪৭ টাকা।"
আমি আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেল উপরে নিয়ে এলাম। তারপর ৪৭ টাকা দিয়ে একটা রুমের চাবি নিলাম। চাবি দিয়ে রুমটা খুলে গেলে সাইকেল ভিতরে নিয়ে এলাম। রুমের ভিতরে নজর বুলিয়ে দেখলাম, রুমের এক পাশে একটা সিংগেল খাট, আর অপর পাশে রয়েছে একটা টেবিল। টেবিলের উপর সযত্নে জগ আর গ্লাস সাজানো আছে। তার মধ্যে জগটা হলো পানি ভর্তি। আমার পেট

তখন দারুন খিদে ছিল। তাই রুমে তালা দিয়ে আবার ম্যানেজারের কাছে এলাম। ম্যানেজার মাথা নিচু করে কি একটা কাজ করছিলেন। আমাকে কথা বলতে শুনেই মাথা তুললেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম — "আপনাদের এখানে কোন খাবার ব্যবস্থা আছে?" উত্তরে তিনি বললেন, "নাই, তবে কিছুদূর গেলেই খাবার হোটেল পেয়ে যাবে"।

এই বলে তিনি আবার কাজ শুরু করে দিলেন। আমি আর ওনাকে বিরক্ত না করে ওখান থেকে চলে এলাম। ঠিক করলাম এখন আর হোটেলে খাব না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খাওয়া যাবে। এই ভেবে আবার রুমে চলে এলাম। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে পর পর দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিলাম। তারপর বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। এমনিতেই দিনের অর্ধেকটা সময় ব্যয় হয়েছে যা

যাতে। তাই শরীরটা ছিল দারুন এ খুব ক্লান্ত। তাই খুব অল্প সময়েই অধিস্মরা হয়ে (ঘুমিয়ে) গেলাম।

যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন সময় সকাল ৬-৩০ টা। আমি বাথরুমে ঢুকে কিছু কাজ সমাধা করলাম। তারপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে কোন মতে দাত মাজার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম। যখন মনে করলাম দাত অন্তত কিছুটা পরিস্কার হয়েছে, তখন সদ্য সন্ডালে ~~পরিস্কার~~ পানি ছিটিয়ে বাথরুম থেকে বেড়িয়ে এলাম। আমার হোটেলে থাকা এখন নিষ্প্রয়োজন। তাই হোটেল থেকে আমার জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে এলাম।

আমি তখন ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে

রয়েছি। ঢাকার রাস্তা ছিল তখন একদম ফাঁকা। সেই ফাঁকা রাস্তায় কতক্ষন সাইকেল চালালাম। যখন রাস্তা আমার মতো ছেলের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লো, তখন সাইকেল চালানো বন্ধ করলাম। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ৮টা বাজে। আমার ঘড়িটা এই অসময়ে ভাল উপকার করছিলো। সে ঠিক ঠিক সময়ে আমাকে সঠিক সময় জানান দিচ্ছিল।

আমার ছিল ক্ষুধার্ত পেট। তার উপর অনেকক্ষন ধরে সাইকেল চালানোর ফলে আরও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। আমার তখনকার প্রয়োজন ছিল পেটে কিছু দেয়া। তাই নিকটস্থ একটা একতলা হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে ৪টা পরাটা আর এক প্লেট ভাঁজি দিতে

বললাম। বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। আমি খেয়ে-দিয়ে হোটেল ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হলাম। ম্যানেজার কলিং বেল টিপলেন। সাথে সাথে কোথা থেকে যেন একটা সুর ভেসে এল, " সাত টাকা।"

পরে লক্ষ্য করলাম আমাকে যে বেয়ারা খাদ্য পরিবেশন করেছে এ কন্ঠস্বর তার। আমি যখন ম্যানেজারকে টাকা দিতে যাব, ঠিক তখন কে যেন বলে উঠলো, " আরও ১টা টাকা বেশী দাও।" আমি লোকটিকে চিনলাম না। আগে কখনও দেখেছি বলেও মনে হয় না। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, " কেন আপনাকে ১টা টাকা বেশী দিতে যাব?"

– " এমনি, একটা চা খাব।"

লোকটির চেহারা ছিল কিছুটা স্বাভাবিক মানুষ হতে ভিন্ন রকমের। তাছাড়া আমার ১৮ টাকার জন্য কোন ফ্যাসাদে যেতে ইচ্ছা করল না। তাই অতিরিক্ত ১টাকা সহ মোট ৮টাকা দিয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে এলাম।

আমার হাতে রয়েছে তখন মাত্র ১০০টাকা। ভাবতে লাগলাম এই ১০০ টাকা দিয়ে আর কয়দিনই বা চলবে। এর ভিতরে কোন একটা উপায় বের করতেই হবে। তা নইলে দশা-রফা শেষ। আমি রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি (রাস্তার পাশ দিয়ে) আর এইসব চিন্তা ভাবনা করছি। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সামনের দিকে। সামনের দৃশ্য দেখে আমি তো একেবারে হতবাক। যে জিনিসটি দেখলাম তা হলো বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা।

তবে এটা আসল জাফলং না। সিমেন্টের তৈরী-নকল জাফলং। যার চারিদিকে পানির ফোয়ারা আছে। আমি নকল জাফলংটাকে দেখছি আর সাইকেল চালাচ্ছি। এমন সময় কারও সাই-কেলের বা রিকশার টায়ার বার্স্ট হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভাবতেই পারিনি যে, আমার সাইকেলের টায়ারই বার্স্ট হয়েছে। নির্বিঘ্নে সাই-কেল চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর যখন একটা ছোট ইটের খোয়ার উপর দিয়ে সাইকেলের বার্স্ট হয়ে যাওয়া টায়ারটি গেল, তখন বুঝতে পারলাম আমারই সাইকেলের টায়ার বার্স্ট হয়েছে। সাথে সাথে নেমে পড়লাম সাইকেলের আরাম-দায়ক সিট থেকে। আমাদের অল্প কিছু দূরেই

তখন নকল তাজমহলটা রয়েছে। এখন কি করব, কিছু ভেবে না পেয়ে নকল তাজমহলটার কাছে গেলাম তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। পরে জানতে পারলাম স্থানটির নাম তাজমহল চত্বর। তাজমহল চত্বরের পাশেই একটা ব্যাঙ্ক রয়েছে। ব্যাঙ্কটার নাম এখন আমার মনে পড়ছে না। সে যাই হোক, সাইকেলটা ব্যাঙ্কের পাশে তালা দিয়ে রেখে ব্যাঙ্কের সামনের দিকে সিঁড়ির এক পাশে বসে পড়লাম। সেখান থেকেও সিমেন্টের তৈরী তাজমহলটাকে দেখা যাচ্ছিল। আমি তাজমহলটাকে দেখছি আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। এক সময়ে মন স্থির করে ফেললাম, আমার সাইকেলটা বিক্রী করে ফেলব। কিন্তু ক্রেতা পাব কোথায়? আমার

পাশে আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় এমনি একটা ছেলে বসে ছিল। আমি তাকে বললাম "ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি। এই সময়ে আমি যদি আমার সাইকেলটা বিক্রী করতে পারি তাহলে হয়তো কিছুটা বিপদ মুক্ত হতে পারবো। আপনি কি আমার সাইকেলটা বিক্রী করার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন? যদি পারেন তাহলে আমার খুব উপকার হয়।"

তিনি বললেন," তাই নাকি! দেখি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি কিনা।"

এই বলে সে কোথায় যেন চলে গেল। যাওয়ার আগে বিড় বিড় করে কি যেন বলে গেল। যার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পর সে তিন-চারজন লোক নিয়ে হাজির হলো। আমাকে উদ্দেশ্য করে তাদেরকে সে বলতে লাগলো, " এই যে, এই ছেলেটা সাইকেল বিক্রী করতে চায়।"

লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, " তোমার সাইকেলের দাম কত?" আমি ব্যবসায়ী লোকের মত বলতে লাগলাম, " নতুন সাইকেল, দাম আর কি বলবো। যে দামে কেনা তার থেকে তিন-চারশো টাকা কম দিবেন। কেনা হলো ২০০০ টাকায়, ১৬০০ টাকা দেন।

লোকটি বললেন, " চোরাই মালের দাম ১৬০০ টাকা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে খোকা।" আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। লোকগুলো

বলে কি, আমার সাইকেল চোরাই মাল।
আমি বললাম, "কি যাতা বকছেন আপনি, এটা চোরাই মাল হতে যাবে কেন।"
—"তুমি বেশী বাড়া-বাড়ি করো না তাহলে ফল খারাপ হবে। আমি বলছি তুমি সাইকেল খানা ৩০০ টাকায় দিয়ে দাও।
—"২০০০ টাকার সাইকেল ৩০০ টাকায়! একি মগের মুল্লুক পেয়েছেন। যান, আপনাদের কাছে সাইকেল বিক্রী করবো না।"
—"সাইকেল বিক্রী করবে না ভাল কথা। কিন্তু তোমাকে এখান থেকে সাইকেল নিতে দিচ্ছি না। এই সাইকেল থানায় যাবে। সেখান থেকে তুমি প্রমাণ দিয়ে তোমার সাইকেল নিয়ে যাও।"

এই বলে তারা সাইকেল টানা-টানি শুরু করে দিল। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। ঘাবড়ানোর সাথে সাথে খুব ভয়ও পেলাম। আমি তাদেরকে বললাম, "আর কিছু টাকা বেশী দেয়া যায় না।" একটা লোক বললো, "না, কোন মতেই না।" আরেকটি লোক বললো, "আচ্ছা ছেলেটা যখন এত করেই বলছে তখন আর একশ টাকা বেশীই না হয় দেয়া যাক।"

এই লোকটির কথায় আরও আরও একটি লোক সায় দিলেন। যে ব্যক্তিটি সাইকেলের দাম ৩০০ টাকার বেশী দিতে চাইলো না সেও কিছুক্ষন পর দ্বিতীয় লোকটির কথায় সায় দিলেন। তারপর তারা একরকম জোর করেই আমার হাতে ৪০০ টাকা গুজে দিয়ে সেখান থেকে তাড়া-

তাড়ি সরে পড়লেন। তাদের তাড়া-তাড়ি সরে পড়ার কারন আমি তখন বুঝতে পারলাম না।

সাইকেল খানা শেষ হওয়ার পর আমার সম্বল ছিলো ;- একটি লুঙ্গি, এক জোড়া স্যান্ডেল, একটি ফুলশার্ট, ৫০০ টাকা ও একটি ঘড়ি। যার সর্বমোট যে মূল্য হতে পারে ৮০০ টাকা। দেখতে পেলাম বাসা থেকে বের হবার সময় আমার মতে আমার কাছে ছিলো ২৫০০ টাকা। আর এখন একদিন হতে না হতেই ৮০০ টাকায় নেমে এলাম। বাকী ১৭০০ টাকা হাওয়া হয়ে উড়ে গেল।

ভগ্নপ্রায় মন নিয়ে কিছুক্ষন পর কমলা চত্বর ত্যাগ করলাম। তখন বাজে ১১টা। আমি তারপর ঠিকানাহীন ভাবে ঢাকার এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক স্থানে দেখলাম একদল

লোকে অনেক গুলো আনারস সামনে নিয়ে বসে আছে। আমি ভাবলাম আনারস কিনে বিক্রী করতে পারলে হয়তো লাভ হতে পারে। এই ভেবে লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাই আনারসের দাম কত?"
লোকটি উত্তরে বললেন, "একটার দাম ৭ টাকা। তুমি কয়টা নেবা?"
— "হিসেব করে দেখেন তো ২০০ টাকায় কয়টি পাব।"
তিনি কিছুক্ষন হিসেব করে বললেন, "প্রায় ৩০টি-কটা। তবে তুমি এক সাথে নিলে ৫/৬ টা বেশী পাবে।"
— "তাহলে আপনি গুনে ২০০ টাকার আনারস দেন।"
তিনি গুনে এক জায়গায় জমা করে রেখে বল-

লেন, " মোট ময়ত্রিকাটা দিলাম।"
আমি ওপার টাকা পরিশোধ করে একটা রিকশা ডাকলাম। রিকশা ওয়ালাকে বললাম, "ধারে-কাছে কোথাও কি আনারস বিক্রী করার মতো কোন জায়গা আছে?"
রিকশা ওয়ালা বললেন, "আছে।"
- "কোথায়?"
- "ফকিরাপুল।"
- "ভাড়া কত?"
- "দশ টাকা।"
আমি উনার সাথে বেশী কথা কাটা-কাটি না করে আনারস গুলো নিয়ে রিকশায় চড়ে বসলাম। ফকিরাপুল পৌছার পর রিকশা ওয়ালা আমাকে আনারস নামাতে সাহায্য করলেন। তারপর একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাতে সযত্নে আনারস-

হলে জানিয়ে দিলেন। আমি ওনাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, "সন্ধ্যার সময় আমি একবার আসবো। আর যদি না আসি কমলাপুর রেল স্টেশনে খুঁজলেই আমাকে পাবা।"

আমি ওনার হাতে দশটা টাকা দিলাম। যাওয়ার সময় উনি বলে গেলেন, "যদি তুমি পান বেচার জন্য একটা বাক্স তৈরী করতে পারো, তাহলে তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে না।"

আমি ওনার কথা বিশ্বাস করলাম। তার উপর উনি আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে তিনি এখানে একবার আসবেন। তাই আমার ভগ্নপ্রায় মনটা একটু স্বস্তি পেল। পরক্ষণেই লোকটার উপদেশের কথা মনে পড়লো। তিনি বলছিলেন

একটা পান বেচার (বিক্রী করার) ব্যাপারের কথা। আমার বিবেক তখন বলতে লাগল, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি পান বেচবে। তুমি এত নীচ, এত নমস্য"। আমি তাকে বোঝাতে লাগলাম যে পান বিক্রী করা খারাপ কিছু নয়। এ দেশে এমন অনেক লোক আছে যারা জীবিকার জন্য এই পথটি বেছে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি বিবেককে বোঝাতে অক্ষম হলাম।

ধীরে ধীরে বেলা ১২টা বেজে গেল। আমি আনারস বিক্রীর প্রতি মন দিলাম। একেকজন খদ্দের আসে। দাম জিজ্ঞাসা করে। দামে তার মত আর আমার মত এক না হলে সে চলে যায়। এক হলে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত কারও সাথে আমার মত এক হয়নি। সুতরাং একটি আনারসও বিক্রী হয়নি।

গড়ে প্রতিটি আনারসের দাম পড়েছে ৮-১০ টাকা। কিন্তু কোন খদ্দেরই ৫ টাকার বেশী দিতে চাইলো না। দেখলাম আনারস বিক্রী করতে হলে আমাকে কিছু লোকসান দিয়েই বিক্রী করতে হবে। তাই ঠিক করলাম এবার যে করেই হোক খদ্দেরের সাথে আমার একমত হতেই হবে। কিছুক্ষন পর একজন খদ্দের এলো। তার সাথে আমার মত এক হল ঠিকই, কিন্তু ৫ টাকার উপরে দাম উঠলো না। সুতরাং তাকে ৫ টাকাতেই আনারস দিতে হলো। এরূপে প্রায় ৫০ টাকার মত আনারস বিক্রী হয়েছে। এমন সময় একটা লোক আমার কাছে এসে বললো, "আমি তোমার আনারস বিক্রী করে দিচ্ছি। তার বদলে তুমি আমাকে কিছু টাকা দিও।"

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। চোখে মুখে

হলো লোকটা ভাল লোকের মানুষ। আমি ভাবলাম উনি বিক্রী করলে হয়তো কিছু লাভ ও হতে পারে। তাই বিনা বাক্য ব্যায়ে ওনার কথায় রাজী হয়ে গেলাম। তারপর থেকে ঐ লোকটিই আনারস ৫ আমাকে নিয়ে বসে পড়লেন। আমি বসলাম ওনার পাশে। কোন খদ্দের আসলে লোকটি এক দাম চেয়ে বসে ৮ টাকা। তাই খদ্দেরের সাথে একবারও তার মত এক হলো না। সুতরাং একটা আনারসও উনি বিক্রী করতে পারলেন না। তখন সময় ১২টা। আমি ওনাকে বললাম, " ভাই, এখানে গোসল করার মতন কি কোন পুকুর আছে?"
—" আছে, কিন্তু একটু দূরে। তুমি এক কাজ কর একটা গামছা কিনে নিয়ে রিকশায় করে চলে যাও গোসল করতে।"

আমি ওনার কথা মতো একটা গামছা কিনে নিলাম। গামছাটার দাম নিলো ২০ টাকা। তারপর ঐ লোকটা একটা রিকশা ঠিক করে দিলেন। আমি সে রিকশায় গিয়ে ছিলাম, গোসল করে আবার সেই রিকশায়ই ফিরে এলাম। পুকুরে মাত্র কয়েকটা ডুব দিতে পারলাম। এইটুকু পথে রিকশাওয়ালা ১০ টাকা দিতে হলো। অন্যত্র হলে যেখানে ২ টাকার বেশী লাগত না। ফিরে এসে দেখি লোকটা একটা আনারসও বিক্রী করতে পারিনি। আমি ওনাকে বললাম, "ভাই, আপনি দাম কমান।"

তিনি তখন দাম কমিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার চেয়ে এক পয়সা বেশী দামেও বিক্রী করতে পারলেন না। লোকটি বিক্রী করছে আর আমি

বসে বসে দেখছি। এমনি ভাবেই সময় পার হতে লাগল। এক সময় আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সূর্য্য আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ দিন শেষ হতে আর বেশী দেরী নাই। আমি ঐ লোকটাকে বললাম, "ভাই, আপনার কাছে কি কোন টাকা আছে?"

তিনি বললেন, "কেন? টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?"

—"না, কিছু না। বলছি কি, যদি থেকে থাকে তাহলে বাকী আনারস কয়টি আপনি কিনে নেন।"

—"আছে তবে, খুব বেশী না।"

—"কত?"

—"এই ধর বিশ - পঁচিশ।"

আমি দেখলাম আমার আনারস আছে আর ও

পেনেরোটি। বাকী ২০টা বিক্রী হয়েছে ১০০ টাকায়।
দেখলাম সন্ধ্যা হচ্ছে আর বেশী দেরী নাই।
টাকার লোক কেমন তা দিনেই আমার মনে হয়ে
গেছে। রাতে মনিনা তারা কতই ভয়ঙ্কর হতে পারে।
তাই লোকটিকে বললাম, "ভাই, কি আর করবো,
একে তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তার উপর আমার
আসবাব রাখার মত রাস্তায় কোন ব্যবস্থা
নাই। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে এই আন-
কম বেণী অতি অল্প দামে বিক্রী করতে হচ্ছে।
আপনি আমাকে পাঁচশ টাকাই দেন।"
আমার মুখে এই কথা শোনা মাত্রই তিনি তড়ি-
ঘড়ি করে পাঁচশত টাকা আমার হাতে দিয়ে
আসবাবগুলো নিয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে
চলে যাওয়ার পরও আমি সেখানে বসে রইলাম।
সকাল বেলায় এক রিকশা ওয়ালা বলেছিলেন এখানে

আসবেন। কিন্তু সন্ধ্যা অবধি বসে থাকার পরও তিনি এলেন না। তখন লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করে কমলাপুর রেল ষ্টেশনে চলে এলাম। তিনি বলে- ছিলেন এখানে থাকবেন। কমলাপুর এসে দেখি সে এক বিষম ব্যাপার। চারিদিকে শুধু লোক আর লোক। তার ভিতর থেকে একটা নির্দিষ্ট লোককে বের করা আমার কর্ম নয়। তাই ও আশা ছেড়ে দিলাম। আমি কমলাপুর রেল ষ্টেশন দেখার জন্য ষ্টেশনের একেবারে কাছে গেলাম। এক সময় ষ্টেশ- নের ভিতরে ঢুকেও পড়লাম। ষ্টেশনের ভিতর স্বাধিন ভাবে ঘোরা-ঘুরি করছি, এমন সময় এক জন পুলিশ এসে আমার কাছে ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করার টিকিট চাইলো। কিন্তু আমি তাকে তা দিতে পারলাম না। অতঃপর সে আমাকে ধরে নিয়ে গেল একটা রুমে। সেই রুমে কয়েকজন লোক

বসে ছিল। আর তাদের সবার পরনেই ছিল সাদা পোশাক। পুলিশটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে, বলতে লাগলেন," এই ছেলেটি টিকিট ছাড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েছে।"

তখন তাদের ভিতর একজন লোক আমার নাম লিখল। তারপর বললো, "৭০ টাকা দেবে না জেলে যাবে?"

—" আমি কি অন্যায় করেছি যে, ৭০ টাকা দিতে হবে, নইলে জেলে যেতে হবে।"

—" তোমার অন্যায় তুমি টিকিট ব্যতিত স্টেশনের ভিতর ঢুকে পড়েছো।"

আমি অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, "আচ্ছা, টাকা কি কম দিলে হয় না?"

—" ২০ টাকা কমিয়ে দিলাম। ৫০ টাকা দাও।"

—" আর কিছুই কি কমানো যায় না।"

—" তাহলে তোমাকে জেলে যেতে হবে।"

-" আচ্ছা, ঠিক আছে। এই নিন ৫০ টাকা।"
তিনি ৫০ টাকা পকেটে খুরে নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বললেন। পুলিশ তখন আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ছাড়া পেয়েই দেখতে পেলাম, একটা ট্রেন এই মাত্র চলতে শুরু করেছে। আমি এক দৌড়ে ট্রেনটার একটা কামরায় ঢুকে পড়লাম। যে দরজা দিয়ে আমি ট্রেনে ঢুকলাম, সেই দরজার সামনেই একটা পুলিশ বসে ছিলো। সে আমার মুখের উপর লাইট মেরে বললেন," তুমি কে? এই ট্রেনে চড়েছ কেন?"
-"আমার বাড়ি।"
-"কত টাকা আছে।"
আমাকে বলার সুযোগ না দিয়েই আমার পকেট থেকে সব টাকা তুলে নিলেন। তারপর বললেন,"এই টাকা গুলো তোমার ভাড়া হিসাবে নিলাম।"
-" এতগুলি টাকা ভাড়া! এ আপনি বলেন কি?"

— " বেশী কথা বললে এই টাকা থেকে একটা টাকাও তুমি ফেরত পাবে না ।"

— " দেখুন, আমি অতি সাধারন একটা ছেলে। আমার টাকা নিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না ।"

— " আমিও অতি সাধারন একটা পুলিশ। সব টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দিলে আমারও কোন লাভ হবে না ।"

— " তাহলে আপনি না হয় কিছু টাকা রেখে আমার বাকী টাকা ফেরত দেন ।"

— " পঞ্চাশ টাকা দিতে পারবো ।"

— " মাত্র পঞ্চাশ টাকা ! আর সব টাকা আপনারা খু[illegible]"

— " বেশী দর কষা । এই নাও আরও ২০ টাকা ।"

— " আর কিছুই কি দেওয়া যায় না ।"

— " আরও কিছু চাও নাকি । তাহলে এই নাও লাঠির বাড়ি ।" এই বলে তিনি ওনার লাঠি দিয়ে মারতে লাগ-

লেন। তাই আমি আর ওনার সাথে কথা বাড়ালাম না। ওনার কাছ থেকে সরে পড়লাম। পরে হিসাব করে দেখলাম, পুলিশটি আমার কাছ থেকে 200 টাকা মত নিয়েছে। ট্রেনটা একটা ষ্টেশনে এসে থামলো। আমি ঠিক করলাম এই ষ্টেশনেই নেমে পড়বো। তারপর যা হয় একটা কাজ খুঁজিয়ে নেব। আমি যখন ট্রেন হতে ষ্টেশনে নামলাম তখন সময় ৫টা পর্যন্ত। লোক জনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম স্থানটির নাম টিটাগড়। আমার মনে পড়লো অনেক আগে, আমার বয়স যখন খুব অল্প ৬ কি ৭। তখন বাবা টিটাগড় একটা টেক্সটাইল মিলে চাকরি করতেন। বাবার সাথে আমি, মা, ও ছোট ভাই এক সাথে থাকতাম। তখন আমরা ছিলাম দুই ভাই। কিন্তু সেই সময়ে টিটাগড় সাথ

এই সময়ের ট্রেনের কোন মিল খুঁজে পেলাম না। আমি স্টেশনের বেঞ্চের উপর বসে আছি, এমন সময় এক বাদাম ওয়ালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "বাদাম দেবো?"
আমি তার মুখের দিকে কতক্ষন তাকিয়ে থেকে বললাম," এক প্যাকেট কত?"
— "এক টাকা।"
— "এক প্যাকেট দাও।"
সে আমাকে এক প্যাকেট বাদাম দিলে আমি তাকে একটা টাকা দিলাম। তারপর বাদামের খোসা ছাড়িয়ে এক একটা বাদাম মুখে দিতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম কেমন মানুষ পেট বাঁচার জন্য কত বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করে। আমিও ভাবতে লাগলাম, দেখি এদের মত কোন কাজ করতে পারি কিনা

তখনই মাথায় চলে এল, চানাচুর বিক্রী করলে ক্যামন হয়। এই পল্লাটার মধ্যে হয়তো আমি কোন আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। তাই সেই সময়েই ঠিক করে ফেললাম আগামিকাল থেকেই আমি চানাচুর বিক্রী শুরু করে দেব। সেই সময়ে আমার একটি মাত্রই প্রয়োজন ছিলো। তা হলো, রাতে থাকার মতো কোন জায়গা বের করা। সেই উদ্দেশ্যে ষ্টেশন থেকে বের হলাম। ষ্টেশনের নিকটেই দেখলাম একটা আবাসিক হোটেল। হোটেল ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এখানে এক রাত্র থাকতে ৩০ টাকা লাগে। আমি আর কি করবো, ওনাকে ৩০ টাকা দিয়েই রাত্রে থাকার মতো একটা রুম বেছে নিলাম। বিছানায় শোয়ার পর এত চেষ্টা করলাম ঘুমাবার জন্য। কিন্তু ঘুম কিছুতেই এলো না।

বাসা থেকে এসেছি আজ দেড় দিন মতো হলো। ভাবছি বাসায় বসে মা এখন করছে কি। হয়তো তিনি এতক্ষনে পুরোদমে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। বাসার কথা আর-ভাবতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম এখনকার অর্থাৎ বর্তমানের কথা। মনে মনে ঠিক করলাম কালকে ঘড়িটা বিক্রী করে চানাচুর বিক্রী করা শুরু করে দিতে হবে। তারপর আল্লাহ পাক যা হয় করুন। এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়-লাম।

সকাল বেলা উঠে হোটেল কল থেকে হাত-মুখ পরিস্কার করলাম। তখন সময় সকাল ৭টা হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে আবার ষ্টেশনে এলাম। উদ্দেশ্য সময় কাটানোর। কারন আমি জানতাম ঘড়ির দোকান ৮ টার আগে খুলবে না। তাই-

এই ১টি ঘন্টা হাতে পেয়ে ষ্টেশনে এসে বসলাম। বসে বসে দেখতে লাগলাম ষ্টেশনের লোকজনদের। আমার নজর বেশী পড়ছিলো তাদের উপর, যারা ষ্টেশনে চানাচুর বিক্রী করে। ভালভাবে তাদেরকে দেখে চানাচুর বিক্রী করার কলা-কৌশল রপ্ত করে নিলাম। যখন আমার ঘড়িতে ৮টা বাজল, তখন ষ্টেশন ত্যাগ করলাম। ষ্টেশন হতে প্রায় কোয়াটার মাইল যেয়ে একটা ঘড়ির দোকান পেলাম। ঘড়ির দোকানদেরকে বললাম, " ভাই, আমি এই ঘড়িটা বিক্রী করতে চাই"। তিনি আমার কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, " এ যে দেখছি পুরোন ঘড়ি।"

—" পুরোন ঘড়ি হলেও এর দাম ভাল।"

-"কত দাম চাও।"
-"১৫০ টাকা দেন।"
-"পুরোন ঘড়ির দাম এত টাকা!"
-"আগেই তো বলেছি এর পার্স ভাল।"
-"না বাপু, আমি তোমার ঘড়ি কিনতে পারলাম না। তুমি বরং অন্য দোকানে যাও।"
-"আচ্ছা কিছু টাকা না হয় কমই দেন।"
-"আমি ৯০ টাকা দিতে পারবো।"
-"আর কিছু বেশী দেওয়া যায় না।"
তিনি কিছুক্ষন চিন্তা করে বললেন, "আর ১০ টাকা বেশী দিতে পারবো।"
শেষ পর্যন্ত ১০ টাকা বেশী অর্থাৎ ১০০ টাকায় দাম ঠিক হলো। আমি ওনার সাথে বেশী কথা না বাড়িয়ে ঘড়িটা ওনার হাতে দিলাম। তিনি-

সময়ে উনি আমাকে ১০০ টি টাকা দিলেন। ঐ
টাকা দিয়ে টেংরির বাজার থেকে চানাচুর বিক্রীর
জন্য একটা ঝুড়ি, ~~প্লাস্টিকের ঝুড়ি~~ [illegible], কয়েকটা লেবু,
১ পোয়া পিঁয়াজ, ১ ছটাক কাঁচা মরিচ ও আরও
কিছু জিনিস কিনলাম, যা চানাচুর বিক্রী করার
জন্য প্রয়োজন। তারপর মুদির দোকান থেকে কিন-
লাম ২ কেজি চানাচুর। পিঁয়াজ-মরিচ কাটার
জন্য একটা ছুরি কিনলাম ফুটপাত থেকে।
সব কিছু কেনার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম,
পকেটে আর মাত্র ১০ টাকা রয়েছে। আমি টাকা
কথা চিন্তা না করে চানাচুর বিক্রীর প্রতি মন
দিলাম। চানাচুর ঝুড়ির ভিতর সাজিয়ে রাখলাম।
একটা ছোট্ট পলিথিনের কাগজে মরিচ আর পিয়াজ
কেটে এক সাথে রাখলাম। যাতে খদ্দের আসলে

-কষ্ট কম হয়। এই কৌশলটা আমি রপ্ত করে-ছিলাম স্টেশনের চানাচুর বিক্রীওয়ালার কাছ থেকে। যখন সব প্রস্তুতি শেষ হলো, তখন চানা-চুর বিক্রী করতে নেমে পড়লাম।

প্রথম প্রথম বিক্রী করার সময় মনের ভিতর কি রকম যেন করতে লাগল। কিন্তু পরে অবশ্য তা ঠিক হয়ে গেল। কোন ট্রেন এসে স্টেশনে থামলে, আমি ট্রেনের কাছে গিয়ে, 'চাই চানাচুর, চাই চানাচুর' বলে হাঁক দিতাম। আমাকে হাতে কেউ সাড়া দিত, কেউ দিত না। অর্থাৎ কেউ চানাচুর কিনতো, কেউ কিনতো না। এমনি ভাবে চানাচুর বিক্রী করতে করতে কেটে গেল অনেক সময়। সূর্য্য যখন আমার মাথার উপর চলে এল, তখন চানাচুর বিক্রী করা ক্ষান্ত দিলাম। বের হলাম গোসল করার মত পুকুরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গায়ে-জোড়

গোসল করার উপযুক্ত কোন পুকুর পেলাম না। অনেক কষ্টে পেলাম ছোট একটি পুকুর। পুকুর তাকে বলা যায় না। বলা যায় ডোবা। তাতে গোসল করা চলে না। কিন্তু উপায় কি? গোসল করতেই হবে। অগত্যা সেই ডোবায়ই গামছা পরে গোসল করতে নামলাম। গোসল ~~শেষ~~ করে গামছা পাল্টিয়ে আবার লুঙ্গি পড়লাম। তারপর মাল পত্র ঝুড়ি নিয়ে স্টেশনের পাশের একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। হোটেলটাতে কিছু খেয়ে-দেয়ে আবার স্টেশনে এসে চানাচুর বিক্রী শুরু করে দিলাম। এমনি ভাবে সন্ধ্যা শেষ হওয়ার পরও অনেক সময় ধরে চানাচুর বিক্রী করলাম। যখন নিজের কাছে পেট আত্ম সমর্পন করলো, তখন আবার স্টেশনের পাশের সেই হোটেলটিতে গেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার চানাচুর বিক্রী শুরু করলাম। চোখ ঘুমের কাছে যখন আত্মসমর্পন করলো, তখন ঠিক করলাম এবার আর হোটেলে ঘুমাব না। ষ্টেশনেই ঘুমিয়ে পড়বো। দেখলাম ষ্টেশনের প্লাটফর্মে অনেক লোক ঘুমিয়ে রয়েছে। আমিও তাদের মাঝে আমার গামছা খানা বিছিয়ে ঝুড়ি খানা মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা উঠে দেখি আমার পায়ের স্যান্ডেল নেই। ভাবলাম হয়তো ষ্টেশনের কোন পকেটমার চোরই চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তাড়া-তাড়ি ঝুড়ির দিকে তাকালাম। ভাগ্য ভাল ঝুড়িটা নিয়ে যায়নি। স্যান্ডেল চুরি হওয়াতে আমি মন কিছুটা কষ্ট পেলাম। কিছুক্ষন পর কষ্টটা মন থেকে তাড়িয়ে দিলাম। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে আবার চানাচুর বিক্রী

শুরু করে দিলাম। রাত্রি হলে অন্যদিনের মত সেখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হলেই আবার- চানাচুর বিক্রী করা। এমনি ভাবেই কেটে গেল পুরো ১৫টি দিন। মাঝে মধ্যে চানাচুর অথবা অন্য কোন জিনিস ফুরিয়ে গেলে, দোকান অথবা বাজার থেকে কিনে আনতাম। মানুষ কোন কিছু বিক্রী করে কিছু না কিছু লাভ পায়। আমিও চানাচুর বিক্রী করে লাভ পেয়েছি। কিন্তু আমার পেট তো সে লাভ শেষ করেছেই তার উপর আবার কিছু লোক-সানও করেছে। তাই ১৫ দিন পর দেখলাম আমার কাছে ঝুড়ি আর কয়েকটা জিনিস ছাড়াও টাকা-পয়সা এম- নকি বিক্রীর- জন্য কোন চানাচুরও নেই। তখন ঠিক করলাম টিটাগড়ে আর নয়। এখন অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে হবে। আমি একটা লোকের কাছে ১৫

টাকা দিয়ে চাঁদপুর বিক্রী করার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র বিক্রী করে দিলাম। ১৫ টাকায় ঐ দিন কোন মতে চালালাম। তার পরের দিন ট্রেন আসতেই অন্যান্য লোকের (যাদের ভাড়া নেই) মতো ট্রেনের ছাদে উঠে বসলাম। তখন আমার সম্বল ছিল একটা ফুল হাতা শার্ট, একটা লুঙ্গি আর একটা গামছা। তখন আমাকে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলে মনেই হতো না। সে যাই হোক, আমি তখন ট্রেনের ছাদে বসে ট্রেনের এক পাশের দৃশ্য দে-খছি, তার খানিক পরে আর একপাশের দৃশ্য দেখছি। এমনি ভাবেই পার হতে লাগলাম ষ্টেশনের পর ষ্টেশন। ছাদে বসা একটা লোকের কাছ থেকে জানতে পারলাম এই ট্রেনটি চট্টগ্রাম যাচ্ছে। ভাবলাম ভালই হলো চট্টগ্রামে

আগে একটা সুন্দর জায়গায় সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছো। সূর্য যখন মাথার উপর তখন সেই জানালো তার সমস্যার কথা। আমি বললাম পয়সা নেই। আমার উত্তর শুনে সে সেই সময়ের মত চুপ করলো। চুপ করলো ঠিক না, চুপ করলাম। কিছু-ক্ষণ পর সে আবার যখন তার সমস্যার কথা জানালো, তখন ট্রেন একটা স্টেশনে থেমে আছে। আমি তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের পাশের একটা হোটেল থেকে দুই গ্লাস পানি সেটা ছাদেই তাকে দিলাম। তার-পর আবার ট্রেনের ছাদে বসলাম। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো। এক সময় সে চট্টগ্রাম সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন টিপ টিপ

চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। তবুও আমি এই স্বল্প আলোতে যা দেখলাম তা কল্পনার-অতীত। দেখলাম ছোট ছোট পাহাড়। তার উপর জন্ম নিয়েছে অনেক বিচিত্র ধরনের গাছ। মাঝে মাঝে দেখলাম ট্রেনের রাস্তা পাহাড়-কেটে তৈরী করা হয়েছে। পশ্চিমের আকাশে কিছুক্ষণ আগে সূর্যের যে লাল আভা দেখ-ছিলাম, তাও এখন নেই। পুব আকাশে চেয়ে দেখলাম সুন্দর চাঁদ উঠেছে। মনে পড়লো এমনি এক চাঁদের রাতে ছিলাম আরিচার নদীতে। চাঁদের আলোতেই দেখতে লাগলাম আমি পাহাড়ের সৌন্দ-র্যকে। এক জায়গায় দেখলাম দুটো পাহাড়ের মাঝে খালের মত সরু একটা নালা। চাঁদের আলো নালার পানির উপর পড়ে চিক চিক-করছিলো। আমি চারিদিকের সৌন্দর্য উপভোগ

করছি আর করছি। অন্য দিকে আমার কোন খেয়াল নাই। যখন অনুভব করলাম ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে থামছে তখন খেয়াল ফিরলো। আমি বুঝতে পারলাম ট্রেন ষ্টেশনে থামবে। একটা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এটা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেল জংশন এ ষ্টেশন। ট্রেন থামার সাথে সাথে সব লোক নামতে শুরু করে দিল। আমিও তাদের পথ অনুসরণ করে নামতে লাগলাম। আমার পেটে তখন প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু পকেটে ১টা পয়সাও নেই। তার উপর আবার অচেনা জায়গা। তাই কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে একটা রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করে দিলাম। কত-দূর যেতে দেখলাম একটা সুন্দর হোটেল। তার-সামনে কয়েকটা বেঞ্চ পাতা ছিল। ক্ষুধার তাড়নায়

আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। তাই একটা গাছের উপরে বসে পড়লাম। ক্ষুধার চোটে আমার নাড়ি-ভুড়ি সব শেষ হয়ে আসতে চাচ্ছিল। আমি জোড় করে তাদের শরীরের ভিতর ঠেসে গুঁজলাম। তাদেরকে আরাম দেওয়ার জন্য কয়েকবার পর পর হোটেলের ভিতর গিয়ে পানি খেতে লাগলাম। কিন্তু পানি আর কত খাব। আজকে সারা দিনটা তো পানি খেয়েই সাবাড় করে দিলাম। আমার পেট কি আর কোন দিন ভরে খাবার যাবে না। না এমনি ভাবেই আমার জীবনের অবসান হবে। বাড়ি থেকে এলাম কি জন্যে। কত সুখের জীবনই না ছিলাম। মা-বাবার বড় ছেলে বলে যাই চাইতাম, তাই

যেতাম। আবার পরক্ষণেই ভাবতে লাগলাম, সেই স্বপ্নের চেয়ে এই দুঃখই আমার কাছে ভাল। এতে মানে কিছু আছে। এমনি সব চিন্তা-ভাবনা করছি, এমন সময় একটা লোক এসে বসলো আমারই বেঞ্চে ওর একটু দূরে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, "বাড়ি কোথায়?"

— "বরিশাল।"

— "এখানে কে আছে?"

— "কেউ নেই।"

— "আর কিছু খেয়েছো?"

— "না, শুধু পানি।"

— "কি! পানি ছাড়া আর তুমি আর কিছুই

খাওনি।"
— "জ্বি না।"
— "আমার সাথে এ দিকে এস। দেখি তোমার খাবারের কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"
এই বলে তিনি আমাকে হোটেলটির ভিতরে নিয়ে গেলেন। ওহো আপনাদের বলতে তো ভুলেই গেছি আমার আসল বাড়ি বরিশাল। মাগুরাতে বাবা চাকরী করতো, তাই মাগুরাতে থাকতাম। সে যাই হোক, ঐ লোকটি আরও কয়েকজন লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করে হোটেলে বসিয়ে আমাকে খাওয়ালেন। পেট এত খিদে থাকা সত্ত্বেও বেশী খেতে পারলাম না। তবুও পেটে দুটো দানা-পানি পড়লে এটাই সান্ত্বনা। তার-পর আবার এসে সেই বেঞ্চিটার উপরে বসলাম।

ধীরে ধীরে লোকজন সবাই হোটেল হতে চলে যেতে লাগল। আমিও এক সময়ে উঠে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য রাতে থাকার মতো কোন জায়গা খুঁজে বের করা। রাস্তা বরাবর কিছুদূর হেঁটে একটা দোকানের সামনে দেখতে পেলাম অনেকখানি আর বাঁধানো খালি জায়গা। তাতে লোকজন ঠাসাঠাসি করে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি অতি কষ্ট করে তাদের ভিতর একটু জায়গা পেলাম। সেই জায়গার উপর গামছা পেতে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়তে না পড়তেই রাজ্যের যত ঘুম আমার চোখে এসে জড় হলো। সুতরাং আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারলাম না।

ঘুম থেকে যখন জাগলাম তখন,

সূর্য আমাকে উঁকি দেয়নি। হাতে কাছে একটা টিউব-ওয়েল পেয়ে গেছেই তা থেকে হাত-মুখ পরিষ্কার করে নিলাম এবং তারপর রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। যখন দোকান খুললো তখন দোকানে কাজ পাওয়া যায় কিনা, তারও চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোন দোকানেই কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। হোটেলেও খোঁজা-খুঁজি করেছি। কিন্তু সেখানেও নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। যখন খুধায় জ্বালা সহ্য করতে পারতাম না, তখন নিকটে কোন হোটেল পেলেই সেখান থেকে পানি খেয়ে নিতাম। এমনি ভাবেই সারা দিনটা পার হয়ে গেল। সন্ধ্যায় পরও দিক্‌দার

কাজের জন্য খোঁজা-খুঁজি করলাম। কিন্তু আল্লাহ আমার প্রতি সহায় হলেন না। তাই কোন কাজ খুঁজে পেলাম না। যখন দেখলাম রাত অনেক হয়েছে, তখন কাজ খোঁজা বাদ দিয়ে খুঁজতে লাগলাম গতরাতের সেই হোটেলটি। আশা, হয়তো আজও সেই লোকটির দেখা পাব। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর শেষ পর্যন্ত হোটেলটা খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষন বসে থাকার পর সেই লোকটিকে হোটেলের দিকে আসতে দেখলাম। আমাকে দেখা মাত্রই তিনি বলে উঠলেন, "একি, আজও কি তুমি কিছু খেতে পাওনি।"
আমি কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বললাম, "না।"
—" কোন কাজ খোজার চেষ্টা করেছ।"
—" করেছি, কিন্তু -----"

— "কিন্তু পাওনি, এই তো বলতে চাচ্ছ।"
— "হ্যাঁ।"
— "আচ্ছা এখন এস কিছু খাবে। কাল আবার কাজের জন্য চেষ্টা কর।"

তিনি পুনরায় আমাকে খাওয়ালেন। খেয়ে-দেয়ে আবার চলে এলাম সেই জায়গায়। গতকাল যেখানে রাত কাটিয়েছিলাম সেখানে। মনে মনে ঠিক করলাম কাল যে করেই হোক একটা কাজ খুঁজে বের করতেই হবে। এই ভেবে লোক-জনদের ভিতর ঠাসা-ঠাসি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আবার সেই টিউব-ওয়েল হতে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। তারপর হাঁটতে লাগলাম। দোকান-পাট খোলতে শুরু করলে দোকান ওয়ালাদের জিজ্ঞেস করতেও

ভুল করিনি। কিন্তু তারা কোন কাজ দিতে পারল না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর একজন দোকানওয়ালা কাজ দিতে পারবেন বলে বললেন। তবে তার নিজের দোকানে নয়, তার পরিচিত একটা হোটেলে। আমি রাজি হয়ে গেলাম তার কথায়। তখন তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন হালি শহরের ছোট্ট একটা হোটেলে। তিনি হোটেল ওয়ালার সাথে কিছু কথা বললেন। তার পর আমাকে আড়ালে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে সেখান হতে বিদায় নিলেন।

আমি কাজ পেয়ে গেলাম হোটেলে। কিন্তু হোটেলের কাজের আমি 'ক' ও জানিনা। তাই কাজ করতে প্রথম প্রথম আমার খুব অসুবিধা হতে লাগল। আমাকে দেওয়া হলো হোটেল টেবিলের কাজ। আমার কাজ হলো কোন লোক হোটেলে এলে তার

কাছে এগিয়ে যাওয়া, তিনি কি খেতে চান জানতে চাওয়া এবং খাবার পরিবেশন করা। তাছাড়া আরও অনেক কাজ আমাকে করতে হতো। যেমন:- পুকুর হতে প্রতি দিন কলস ভর্তি করে পানি আনা, টেবিল পরিষ্কার করাসহ হোটেল পরিষ্কার করা, ইত্যাদি।

হোটেলে আমি আমার পরিচয় দিয়েছিলাম এই বলে যে, আমার কোন মা-বাবা নেই। তাই তারা (হোটেলের লোকেরা) মোটা-মুটি ভাল চোখেই দেখত। হোটেলের কাজ করতে করতে কয়েক দিন কেটে গেল।

একদিন পাশের একটা মুদির দোকানের ছেলে কথা প্রসঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইলো, —"সত্যিই কি তোমার কোন মা-বাবা নেই।"

আমি তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকলাম। কোন উত্তর দিতে পারলাম না। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো -," সত্যিই কি তোমার কোন মা-বাবা নেই ?"

এবার আমার মুখ খুলল। আমি তাকে বললাম, " সত্যি কথা বলতে পারি এক শর্তে।"

-" কি শর্তে ?"

-" তুমি আমার কথা কাউকে বলবে না।"

-" কাউকে বলব না।"

-" তোমার মাথা ছুঁয়ে বল।"

-" ঠিক আছে, এই আমি আমার মাথা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলবো না।"

-" তাহলে শোন, সত্যি বলতে কি আমার মা-বাবা সবাই আছে।"

—" তাহলে এখানে যে বললে, তোমার মা-বাবা কেউ নেই।"

—" মিথ্যা বলেছি।"

—" কি কারণে মিথ্যা কথা বলতে গেলে।"

—" কারন, আমি কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যেখানেই কাজ খোঁজতে গিয়েছি সেখানেই আমি সত্যি কথা বলেছি। আমার সব কথা শুনে তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন ঠিক করলাম দেখি মিথ্যা কথা বলে কোন কাজ পাই কিনা। কি আশ্চর্য! মিথ্যা বলার সাথে সাথে এই হোটেলে কাজ পেয়ে গেলাম।"

—" তুমি খুব অন্যায় করেছ।"

—" আমি স্বীকার করছি আমার খুব অন্যায় হয়েছে।" তোমার দোহাই তুমি এই কথাটি কাউকে বল না।"

সে মিটি মিটি হেসে বললো, "ঠিক আছে, বলতো না।"
তার মিটি মিটি হাসার কারণ তখন বুঝতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম তখন, যখন হোটেল-ওয়ালা আমার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "বের হয়ে যা আমার হোটেল থেকে। মা-বাপ থাকতেও বলছিস মা-বাপ নেই। মিথ্যেবাদী কোথাকার। যা, বের হয়ে যা।"
আর চিৎকার শুনে অনেক লোক সেখানে মড়ো হল। তারা কি ব্যাপার বুঝতে পেরে মাটিতে থুথু ফেলতে লাগলেন। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। লজ্জায় দ্রুত পা চালাতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে সামনের দিকে। যাওয়ার সময় দেখলাম সেই ছেলেটি ঠিক সেই প্রকই-

* আমার জীবন সত্যকথা *

তারে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগল। তাকে দেখে আমার মনে হলো কথা। কিন্তু আমার কোন কাজ হলো না। বরং বিবেক আমাকে বোঝাতে লাগল নিজেকে জাগিয়ে তোলো মন। আমি বিবেকের উপদেশে সাড়া দিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম আর মিথ্যা কথা বলব না। মনে ভোলাবো ও না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। যখন হোটেল থেকে বের হয়েছিলাম তখন সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি ছিল। এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে এল। আমি হাঁটছি এমন সময় আমার একটা লোক দেখে থেমে গেলাম। একদিন কি কারণে সেই হোটেল থেকে বাইরে

যে হয়ে দিলাম। সহসা কোথা থেকে যেন এই লোকটি এসে আমার হাত ধরলো। তারপর বললো, "তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।"
—"কোথায় ?"
—"তা পরে বলবো।"
এই বলে তিনি আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন। আমি সহসা বুঝে ফেললাম উনি কে। উনি আমাকে ধরি ধরে নিয়ে হয়তো আমাকে মেরে ফেলবেন। তারপর আমার শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন :- চোখ, রক্ত, কিডনি, হৃৎপিণ্ড) চড়া দামে বিক্রী করবেন। আর তা নাহলে আমার পা ভেঙে আমাকে কোন এক স্থানে ভিক্ষা করতে বসিয়ে দেবেন। ভিক্ষা করে যা পাব সবই উনি নিয়ে নেবেন। বিনিময়ে আমাকে দেবেন দু মুঠো ভাত। এই সব কথা চিন্তা করে আমার

বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগলাম কিভাবে ওনার হাত থেকে কাটতে পারবো। এখন হয়তো আমি চিৎকার করে লোক জড় করতে পারি। কিন্তু ও সাহস আমার হলো না। তাই খুঁজতে লাগলাম অন্য কোন উপায়। আমার নিজের অজান্তেই উপায়টা আমার হাতে চলে এল। এতক্ষণ উনি আমাকে ওনার দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন। যখন দেখলেন আমি নড়া-চড়া করছি না। উনি যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যাচ্ছেন। তখন উনি আমাকে দুই হাতের বদলে এক হাত দিয়ে ধরে রাখলেন। এই অবস্থাকে আমি উত্তম সুযোগ মনে করে ওনার হাতে বসিয়ে দিলাম জোরে একটা কামড়। কামড়ের জ্বালায় উনি আমাকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ওনার

নিমেষ ওমাত্রেই আমার হাত ওনার হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেল। হাত মুক্ত হওয়া মানেই আমার নিজের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আমি এই সম্ভাবনা কে সত্যিতে পরিণত করার জন্য দিলাম আমার সারা শরীরের জোরে দৌড়। দৌড়ে আমার সাথে আমার খুব কম ছেলেই পারতো। স্কুলের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে প্রায়ই দৌড়ে একটা প্রাইজ পেতাম। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। উনি আমাকে ধরার জন্য দৌড় দিলেন ঠিকই। কিন্তু ধরতে পারলেন না। এক দৌড়ে পৌঁছে গেলাম হোটেলে। আর আমার তারই সাথে দেখা হবে। এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমাকে দেখে উনি বিস্ময় হাসি হাসলেন। ওনার হাসি দেখে আমি ভয়

পেয়ে গেলাম। ঐ আমার কাছে এসে উনি বললেন "কি হে, সেদিনকে ঐ রকম দৌড় দিয়েছিলে কেন?"
আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। উনি আবার বললেন, "সে যাই হোক। এখন আমাদের সাথে এস। এক কাপ চা খাবে।"
আমি ভাবলাম উনি চা খাওয়ানোর কথা বলে আমাকে হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন। তাই ওনাকে বললাম, "আমি চা খাইনা।"
— "চা খাওনা, তাই বলে এখন খাবেনা, এমন তো কোন কথা নেই।"
আমি দেখলাম ওনার সাথে আমি কথায় পারবো না। তাই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ পর উনি আবার বললেন, "তোমার কোন ক্ষতি আমি করবো না। আজ থেকে তোমাকে আমি ভাই

বলেই গ্রহন করে নিলাম।"
আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, উনি আমাকে কথার মাধ্যমে ভুলাতে চাচ্ছেন। এই কথার মাধ্যমে কাউকে ভুলানো, আমাদের স্কুলের ছাত্রদের (বিশেষ করে আমার ক্লাসের ছাত্রদের) একটা হবিতে পরিণত হয়ে ছিল। আমাদের ভিতর সব সময় একটা প্রতিযোগীতা লেগেই থাকতো, কে কত কাউকে কথার মাধ্যমে ভুলাতে পারে। দৌড়ের মত এ প্রতিযোগিতাও আমার সাথে অনেকে পারতো না। সেই ভরসাতেই ওনার সাথে কথার প্রতিযোগিতায় নামলাম। আমি ওনাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "আপনি আমাকে যেহেতু ভাই বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেহেতু আমার পিছনে আপনি আর লাগবেন না।"
উনি বললেন, "আসলে, তুমি খুব চালাক।

তোমার সাথে আমি চালাকীতে পারলাম না। স্বীকার করছি আমি একটা খারাপ লোক। খারাপ লোক হিসাবে তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। তা হলো, আমার কাছ থেকে তুমি হয়তো রক্ষা পেয়ে গেলে। কিন্তু এই শহরে আমার মত আরও অনেক খারাপ লোক রয়েছে। তাদের হাত থেকে তুমি রক্ষা নাও পেতে পার। তাই বলছি কি, তাড়াতাড়ি যে কোন একটা কাজ খুঁজে নেও। আশা করি আমার উপদেশটা তুমি মেনে চলবে। এখন এস, এক কাপ চা খাও।

আমরা লোকের পাল্লায় পড়লাম তো। জীবনে আমি অনেক লোকের সাথে কথায় প্রতিযোগীতায় নেমেছি। কিন্তু এই রকম লোক দেখিনি কোন দিন। নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে

কথার প্রতিযোগীতা করে, এমন লোক জীবনে এই
প্রথম দেখলাম। আমিও হেরে যাবার পাত্র নই।
ওনাকে বললাম, "ভাই আপনার উপদেশের জন্য
অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার অনুরোধটা রক্ষা
করতে পারছি না। আমি আপনার সাথে চা
খেতে যেতে পারছি না।"
উনি বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যা মনে কর।
আমি তোমার জন্য দোয়া করছি তুমি যেন ভাল
থাক।"
এই বলে উনি চলে গেলেন। আমি ঐ লোক-
টার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলাম।
কিন্তু আমার এই কৃতজ্ঞ বোধটা বেশী সময়
থাকলো না। ঐ লোকটা আমার কাছ থেকে
কতদূর গিয়ে আর একটা লোককে, আমাদের

উদ্দেশ্য করে চাপাস্বরে কি যেন বলছেন। প্রথম ব্যক্তির (আমার সাথে যার কথা হচ্ছে) কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি (আমার সাথে যার কথা হয় নি) আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সাথে সাথেই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, উনি (দ্বিতীয় ব্যক্তিটি) আমাকে ধরতে আসছেন। আমাকে ধরেই হয়তো উনি বলবেন, "পকেট- চোর, পকেট মাইরে, আর যাবে না পাওয়া।" উনার কথা শুনে নিশ্চই পাবলিক জড়ো হবে। আর বাংলার পাবলিকদের তো আবেগটাই বেশি। তাদেরকে যা বোঝানো হয় তাই তারা বোঝেন। যদি কেউ কোনমতে তাদের বোঝাতে পারে যে, আমি পকেট চোর। তাহলে তারা (পাবলিকরা) সহজে কিল এক আমার পেটে, পিঠে, বুকে,

সামনে এসে পড়বে। এই ভয়ে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না। দৌড়াতে লাগলাম, চিক ওনার (যিনি আমাকে নিতে আসতেছিলেন) বাড়ীতে। দৌড়ে আমি ভাল তা তো সবাই জানি। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। উনি আমার সাথে দৌড়িয়ে পারলেন না। দৌড়াতে দৌড়াতে যখন ভাবলাম আমি ওনার হাত থেকে মুক্ত তখন দৌড় বন্ধ করলাম। ধীর গতিতে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দেখলাম সামনে একটা মসজিদ। তখন মসজিদে এশার আযান হচ্ছিল। ভাবলাম এই মসজিদে এশার নামাযটা পড়ে যাই। এই-ভেবে মসজিদের পাকা পুকুর হতে ওজু করি।

সেরে ফেললাম। তারপর মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ~~[illegible]~~ মসজিদে ঢুকে দেখলাম আমার থেকে কিছুটা বয়সে বড় ~~[illegible]~~, এমনি একটা ছেলে। সে মসজিদের এক কোনে বসে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করছে। আমিও কিভাবে কোরআন শরীফ পাঠ করতে হয় তা জানতাম। তাই আর বিলম্ব না করে মসজিদের তাক থেকে একটা কোরআন শরীফ নামিয়ে আনলাম। তারপর আরেকটা তাক থেকে রেয়াল* এনে মসজিদের ভিতরে বসে পড়তে শুরু করে দিলাম।

***

(রেয়াল* হলো কাঠের তৈরী জিনিস। যার সাহায্যে কোরআন শরীফ উপরে রেখে পড়া যায়।)

কিছুক্ষন পর একটা লোক এসে আমাকে বললেন
- "এখন পড়া বন্ধ দাও।"
আমি বললাম, " কেন ?"
- " এখন নামাজ হবে।"
আমি তার কথা না বাড়িয়ে কোরআন শরীফ এবং রেহাল যথাস্থানে রেখে দিলাম। তার-পর আরো সাথে নামাজ পড়তে দাড়িয়ে গেলাম। যে লোকটি আমাকে কোরআন শরীফ পড়া বন্ধ করতে বলে দিলেন, সেই লোকটি তিনিই সবার সামনে দাড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম উনিই মসজিদের ইমাম সাহেব। নামাজ শেষ মস-জিদ থেকে বের হয়ে এলাম। মসজিদের পুকুরের পাড়েই ছিল একটা ইটের তৈরী বেঞ্চ। তাতে

* আমার জীবন সত্যকথা *

যেমনটি থাকে। আমি আনন্দ-বিহ্বলে কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই ভেতরটিতে ঢুকে পড়লাম। সবাইকে দেখলাম এক এক করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, যার যার বাড়ির উদ্দেশ্যে। এক সময় মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি আমাকে ভেতরে উপর ঢুকে থাকতে দেখে বললেন, "কে এখানে?"

আমি ভয়ে উত্তর বললাম, "হুজুর আমি।"

—"ও তুমি! তোমাকেই না মসজিদের ভিতরে কোরআন শরীফ পড়তে দেখেছি। তা এখানে ঢুকে ওখানে কেন?"

—"যাবার যে কোন জায়গা নেই, তাই।"

— " কোন কাজ করতে পারো না ।"
— " কাজ করতে চাই । কিন্তু পাইনা ।"
— " তাই বলো ! এ আগে বললেই হয় ।"
তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার তিনি বললেন ," এখন আমার সাথে চলো । আমার কাছে আর রাত থাকবে । আগামীকালকে তোমার একটা ব্যবস্থা করা যাবে ।"
এই বলে উনি আমাকে ওনার বাসায় নিয়ে গেলেন । তারপর একটা চকি দেখিয়ে দিয়ে বললেন ," ওটাতে শুয়ে পড় ।"
আমি ওনার কথামত চকিটাতে শুয়ে পড়লাম । সাথে সাথে ঘুমিয়েও পড়লাম । না ঠিক ঘুমিয়ে পড়লাম না , ঘুমিয়ে

গেলাম। কোথায় যে গেলাম তা আমি নিজেও জানি না। হয়তো কোন স্বপ্নের রাজ্যেই গিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনি হুজুর আমাকে ডাকছেন। তিনি ডেকেছিলেন, ফজরের নামাজ পড়ার জন্য। হুজুর ডাক যখন আমার কানে পৌঁছালো, তখন স্বপ্নের জগতকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম বস্তুর জগতে। অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তারপর হুজুর আর আমি রওনা দিলাম মসজিদের উদ্দেশ্যে। মসজিদের কাছে এসেই সেই পুকুর হতে দুজনে ওজু করে নিলাম। তারপর মসজিদের ভিতর ঢুকে পড়লাম। মুয়াজ্জিন আগেই তার আযান পাঠ সেরে ফেলেছিল।

আমার জীবনের সত্যঘটনা

আমরা ~~ক~~ মসজিদে পৌঁছানোর আগে কিছু লোক মসজিদে সমবেত হয়ে ছিল। পৌঁছানোর পর কিছু লোক সমবেত হলো। অপেক্ষা-উদ্দেশ্য নামাজ পড়া। যখন নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময় আমাদের সামনে হাজির হলো, তখন সবাই নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম কাতার বিন্যাসে। নামাজ শুরু হলে আমরা সবাই মাথা নত করে বুকে হাত বাঁধিলাম। এমন ভাব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলাম, যেন আল্লাহর কাছে আমরা মস্ত বড় অন্যায় করে ফেলেছি। সেই অন্যায়ের জন্য তার কাছে অসহায় ভাবে আমরা মাফ চাচ্ছি। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম, তখন মনে হলো

* আমার জীবনের সত্যকথা *

আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেননি। তাই তার পা জড়িয়ে ধরে একান্ত অনুশোচনার সাথে মাফ চাচ্ছি। আমাদের সব দোষ ক্ষমা হলো মোনাজাতের পালা। মোনাজাত শেষে যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে এলাম, তখন মনে হল আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিয়েছেন। তাই এবং আমাদের মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাই আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছি। আমি মসজিদের বাইরে এসে হুজুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুজুর মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে দরজায় উনার জুতা নিয়ে গেলেন। তারপর উনার [illegible] তুলে থেকে

পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, "এই টাকা দিয়ে কিছু খেয়ে নিও। তারপর ঐ সমুদ্র বেড়ির- কাছে গিয়ে একটা হোটেল দেখতে পাবে। সেই হোটেলে সোহরাব নামে একটা ছেলে কাজ করে। সোহরাবের কাছে আমার কথা বললে হয়তো ও তোমাকে কোন কাজ দিতে পারবে।"

আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হুজুর বেড়ি- জিনিসটা কি?"

— "বেড়িও চেন না। বেড়ি হলো সামুদ্রিক বন্দর। যেখানে জাহাজ থামে।"

— "তাই বলেন! আমি ভাবলাম কি যেন কি।"

— "থাক, আর কি যেন কি জেনে কাজ নেই। এখন যেখানে যেতে বললাম সেখানে যাও।

* আমার জীবনের সত্যকথা *

দেখ লোকের কোন কাজে দিতে পারে কিনা।" আমিও আর কথা না বাড়িয়ে হুজুরের কথামত ৫ নম্বর বাড়ি উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পরে একটা হোটেল থেকে হুজুরের দেওয়া ৫ টাকা দিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে শুরু করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত অনেক হাঁটা-হাঁটির পর ৫ নম্বর বাড়িতে পৌঁছতে পারলাম। বাড়ি পাশে অনেকগুলো হোটেল দেখতে পেয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি ভেবে পেলাম না কোন হোটেলটিতে লোকের দরকার। তাই প্রত্যেকটি হোটেলে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম এই বলে, "এখানে লোকের দরকার

কোন হোটেলে কি কাজ করে ?"
অনেক খোঁজা - খুঁজির পর সোহরাব যে হোটেলটিতে কাজ করে, সেই হোটেলটি খুঁজে পেলাম। কিন্তু সোহরাব তখনও হোটেলে এসে পৌঁছায়নি। তাই তার আসার অপেক্ষায় হোটেলের চেয়ারে বসে রইলাম। কিছুক্ষন বসে থাকার পর সোহরাব হোটেলে এল। আমাকে সে চিনতো না। আর চিনবেই বা কি করে। আগে কি কখোনো দেখা হয়েছে, যে, আমাকে সে চিনবে। যখন আমার কাছ থেকে ও জানতে পারলো হুজুর আমাকে পাঠিয়েছে, তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, "এই হোটেলে তো কোন কাজ নেই। দেখি তোমার জন্য অন্য কোন হোটেলে কাজ

যোগাড় করতে পারি কিনা।"
এই বলে সে আমাকে নিয়ে হোটেলের বাইরে যেতে উদ্যত হলো। হোটেলের দরজার কাছে এসে ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "কিছু খেয়েছ?"
আমি ওর উত্তরে বললাম, "খেয়েছি।"
আমার খেয়েছি কথাটা কানেও না তোলার ভান করে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো, "এখানে বস, আমি একটু পরে আসছি।"
এই বলে সে হোটেলের রান্নাঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো। কিছুক্ষণ পর সে আমার জন্য চারটি পরোটা ও একপ্লেট ভাজি নিয়ে এল। আমি ওকে বললাম, "খামোখা, এই

খাবার আমার কোন দরকারই ছিল না।
উত্তরে ও বললো, "এ খামোখা না। তোমার
এই খাবারের প্রয়োজন ছিল।"
আমি ওর সাথে আর কথা বাড়ালাম না।
খাওয়া শেষে আমাকে নিয়ে সে হোটেল থেকে
বের হয়ে এল। তারপর একের পর এক হোটেলে
জিজ্ঞেস করতে লাগল আমার কাজের জন্য।
কিন্তু কোন হোটেলে কাজ পাওয়া গেল না।
আমি তখন সোহরাবকে বললাম, "ভাই তুমি
আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ। আর না,
এখন আমি নিজে চেষ্টা করে দেখি কোন কাজ
খুঁজে পাই কিনা।"
ও বললো, "সে কি! এখনই হাল ছেড়ে দেবে? হুজুর যখন তোমাকে

* আমার জীবনের সত্যকথা *

পারবে, তখন তোমার একটা উপকার তো করতেই হবে।

–"তুমি আমার জন্য উপকার করে দেবার চেষ্টা করেছ। এটাই যথেষ্ট।"

–"না, এটাই যথেষ্ট না। তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি।"

আমি দেখলাম, ওর সাথে কথায় পারবো না। তখন ওর কাছ থেকে জোর করে বিদায় নিলাম। এ জন্য ও খুব মন খারাপ করেছে।

সাহেবদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর এসে পর এক হোটেল থেকে শুরু করে মুদির দোকান, যন্ত্রপাতির দোকান, ঔষধ-

সব, ঘড়ির দোকান ইত্যাদি যাবতীয় দোকানে
কাজ খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কোন কাজ
পেলাম না। কাজ খুঁজতে খুঁজতে দুপুর গড়িয়ে
বিকেল হয়ে গেল। তবুও কোন কাজ খুঁজে
পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির
পর, যখন রাত্র হয়ে এলো, তখন কাজ
খোঁজা বাদ দিলাম। খুঁজতে লাগলাম গত-
কালের সেই মসজিদটি। অনেকক্ষণ ঘোরা-
ঘুরির পর মসজিদটিতে খুঁজে পেলাম।
তারপর মসজিদের কাছের সেই পুকুরটি হতে
ওজু করে মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়লাম।
কিছুক্ষণ পর মুয়াজ্জিন এশার আযান
দিলেন। আযান শেষে মসজিদে যে কয়জন

সেজদা দিলাম, তারপর মোনাজাত করে শেষ করলাম। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেব মসজিদের ভিতরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে ডেকে নিয়ে গেলেন মসজিদের এক পাশে। তারপর চাপাগলায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "আহমদ কি কোন খবর দিতে পারেনি?"

— "তার কোন দোষ নেই। সে অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছে। কিন্তু কোন খবর খুঁজে পায়নি।"

— "আচ্ছা, এখন নামাজ পড়। নামাজ শেষে দেখা যাবে।"

এই বলে তিনি সব লোকের সামনে দাঁড়িয়ে

* আমার জীবনের সত্যকথা *

গেলেন নামাজ পড়ানোর জন্যে। আমরা সবাই ওনার পিছনে সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব আমাদের উদ্দেশ্য করে মসজিদের সব লোকদের বললেন, " এই ছেলেটা কাজ করতে চায়। কিন্তু কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। আপনারা যদি ওকে একটা কাজের সন্ধান করে দিতে পারেন, তাহলে আমি খুব খুশি হতাম।" হুজুরের মুখে এই কথা শোনা মাত্রই একটা লোক বলে উঠলো, " আমি এই ছেলেটাকে একটা হোটেলে কাজ দিতে পারবো।
হুজুর বললেন, " ঠিক আছে, আপনাকে ওকে-

সেই চলতে।"
তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে আমার উনি (হুজুর) বললেন, "যাও ওনার সাথে।"
আমি হুজুরের অনুমতি পেয়ে ও লোকটার সাথে রওনা হলাম। মসজিদের একেবারে নিকটেই ছিলো হোটেলটি। হোটেলে বসে ছিলেন একজন বুড়ো মোটা মানুষ। আমাকে যে লোকটা নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হোটেলের ঐ বুড়ো লোকটাকে বললেন, "চাচা, একদিন আপনি বলেছিলেন যে, আপনার একটা ভালো লোকের দরকার। তাই-এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি।"
বুড়ো লোকটি বললেন, "এনেছেন! এতো ভালো

করেছেন।"

তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি (মুড়ো লোকটি) বললেন, "এর আগে কোন হোটেলে কি কাজ করেছ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ করেছি।"

– "কোন হোটেলে?"

– "হালি শহরের একটা হোটেলে।"

_ "ঠিক আছে। তোমাকে আমার হোটেলে কাজে নিলাম। প্রতি মাসে তোকে ৩০০ টাকা। আর খাবার দিব।"

আমি ওনার কথা রাজী হয়ে গেলাম। যে লোকটা আমাকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি কিছুক্ষণ পর চলে গেলেন।

* আমার জীবনের সত্য কথা *

আমি ঐ হোটেলে উঠে গেলাম। ধীরে ধীরে হোটেলের কাজও শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম নতুন জায়গায় কাজ করতে আমার যেন কেমন লাগছিল। অবশ্য কিছুদিন কাজ করার পর তা ঠিক হয়ে গেল।

হোটেল ওয়ালার তিন ছেলে। আর তিন ছেলেই হোটেলে কাজ করে। আর প্রত্যেকেই আমার চেয়ে অনেক বড়। তিনজনের দুইজন করতো রান্নার কাজ। আর একজন করতো টেবিলের কাজ। হোটেল ওয়ালা নিজে করতেন হিসাবের কাজ। পূর্বের হোটেলে যে কাজ ছিল আমারও সেই কাজ দেওয়া হলো। অর্থাৎ টেবিলের

কাম। আছাড়াও আমার করতে হতো খাল-বন্দর পরিষ্কার, পুকুর থেকে পানি আনা, টিউব ওয়েল থেকে পানি আনা ইত্যাদি।

এখানকার ~~সব~~ হোটেলের খাবার পানি নিকটবর্তী একটা টিউব ওয়েল থেকে নিয়ে আনতে হতো। আমি যে হোটেলে কাজ করতাম সেই হোটেলওয়ালা ছিল প্রচণ্ড চালাক-চতুর লোক। তিনি পুকুর-এর পানি আর টিউব ওয়েলের পানি একত্রিত করে মানুষকে খাওয়াতেন। এটা তার অন্যায় হলেও কিছু করার নেই। কিন্তু তিনি কি মানতেন তার এই অন্যায়

কাঁচা পয়সা লাভের জন্য যত লোকের এত মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। হয়তো জেনে শুনেই তিনি এই কাজে হাত দিয়েছিলেন। অথচ অজ্ঞতার জন্য মানুষ জানেননি দূষিত পানি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমি কিছু বুঝতে পেরেছিলাম তিনি জেনে শুনেই এই কাজে হাত দিয়েছেন। কেননা তিনি কোন সময় খাবার পানি খেতেন না। আমি ওদের এই পদ্ধতি সহজ ভাবে মেনে নিতে পারলাম না। তবুও একান্ত বাধ্য হয়েই সব কিছু সহ্য করতে হতো।

প্রতিদিন স্কুল থেকে উঠতাম। সন্ধ্যা

আমাদেরও কাজ । ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ না ধুয়েই হোটেলের প্রাথমিক কাজ করতে হতো । যেমন :- হোটেল পরিষ্কার করা, থালা-বাসন পরিষ্কার করা ইত্যাদি । যখন কাজ করতে করতে সকাল হয়ে যেত, তখন কয়লা দিয়ে দাঁত মেজে পুকুর থেকে হাত-মুখ ~~ধুতাম~~ পরিষ্কার করতাম । তারপর আবার হোটেলে এসে হোটেলের কাজ শুরু করে দিতাম । সকালের নাস্তার সময় আমাদের দেওয়া হত চার-পাঁচটা রুটি আর ভাজি । খাওয়া-দাওয়ার পরে পুনরায় দুপুর ২টা-২টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো ।

দুপুরের খাবার আমার উনার জন্য দিতো দুই প্লেট ভাত তার সাথে অন্য যে কোন তরকারী। রোজই দিতো আমার জন্য ভর্তা শাক-সবজী।

যদি হোটেলের খাবার পানি ফুরিয়ে যেত তাহলে প্রথম আমাদের টিউব ওয়েলের পানি দিয়ে আমার জন্য পাকান হতো। তাদের পাকান হতো পুকুর থেকে পানি আনার জন্য। এ দুটো হাঁড়ায় পানি একত্রিত করে হোটেলের খাদিমদের হাত-ধোয়া হতো। হোটেলওয়ালার একটু দয়া ছিল। তিনি এই নির্দিষ্ট পানিতে পুকুরের

আমার জীবনের সত্য কথা

পানি বেশী দিলে ও তাতে ফিটকারী দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করার একটা চেষ্টা করতেন। কিছুদিন ফিটকারী দেয়ার পর যখন দেখলেন এতে তা খরচ বেশী হচ্ছে, তখন উনি ফিটকারী দেওয়া বন্ধ দিলেন।

একদিন হোটেল ওয়ালার বড় ছেলে আমাকে বললো, "আজ ঘুরতে যাবি?"
আমি বললাম, "কোথায়?"
–"কেন, সমুদ্রে।"
–"সমুদ্র কোথায়।"
–"বেশী দূরে নয়। এখান থেকে ১ মাইল দূরে।"
–"যাব।"

—" তাহলে চল।"
এই বলে সে হোটেলের ভিতর থেকে একটা পেন্নি* নিয়ে এল। তারপর বললো, "চল।"
আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, " মাছ দিয়ে রাখবে কিসে?"
সে বললো, " বড্ড, ভুলে গেছি। তুই এখানে দাঁড়া আমি একটা ঝুড়ি আনছি।"
এই বলে সে আবার হোটেলের ভিতর প্রবেশ করল। তারপর একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে বের হয়ে এল। সব প্রস্তুতি শেষ হলে আমরা

—×——×—

পেন্নি* হলো এক ধরনের জাল। যার চারপাশে কাঠি বেড়া থাকে। পানির ভিতরে ডুবিয়ে তোলে নিতে হয় মাছ ধরার জন্য।

মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

প্রায় ১মাইল মতো হেঁটে আমরা সমুদ্র দেখতে পেলাম। জীবনে এই আমি প্রথম সচক্ষে সমুদ্র দেখতে পেলাম। তাই সমুদ্র দেখার সাথে সাথে আমার সর্বাঙ্গ দুলে উঠলো। আমরা আস্তে আস্তে সমুদ্রের কাছে অগ্রসর হতে লাগলাম। এক সময়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে নেমে পড়লাম।

তখন সমুদ্রে ভাঁটা ছিল। হোটেল-ওয়ালার বড় ছেলে জিন্নুমান মাছ ধরাতে পর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। এক সময় আমার হাতে জাল দিয়ে বললো, "তুই মাছ ধর, আমি একটু জিরিয়ে নেই।"

— "ঠিক আছে।"

তারপর থেকে আমিই মাছ ধরতে শুরু করে দিলাম। বেন্টিটা অনেকসময় দিয়ে সমুদ্রের কূলের পানিতে টানলাম। তারপর আমি বোটে উঠিয়ে আনলাম উপরে। কখন এতসময়ে যে মাছ বেন্টি জালে পড়েছে তা বেচে শেষ নেয়া যায়। উপরে উঠেই বেন্টির ভিতরে দেখতে পেলাম একটা সাপ। আমি আর আগা-গোড়া চিন্তা ভাবনা না করে দিলাম এক দৌড়। তারপর হোটেল ওয়ালার বড় ছেলেকে বললাম, "বেন্টিতে সাপ উঠেছে"। সে আমাকে বললো, "সাপ উঠেছে তো কি হয়েছে। তাই বলে দৌড়ে

পালাতে হয় নাকি"।

এই বলে সে এক দৌড়ে বেন্নিটার কাছে গেল। আমি তার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বেন্নির কাছে গিয়ে সে বেন্নিটা আস্তে করে মাথায় তুললো। ফলে সাপটা আস্তে আস্তে বেন্নি থেকে বের হয়ে গেল।

সেদিনকার মতো সাপ ধরা এই পর্যন্তই ইতি করলাম। চলে এলাম হোটেলে। পুকুর থেকে গোসল করে কিছু খেয়ে নিলাম। তার পর বিশ্রাম নিয়ে আমার হোটেলের কাজ শুরু করে দিলাম।

হোটেলের পাশেই ছিলো শারিরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তাই হোটেলের বেশীর ভাগ লোকই আস-

ভেন নাকি। ওনারা হোটেলে বসে খাবার-খাওয়ার সাথে সাথে হরেক রকম আলাপ করতেন। ওদের আলাপ থেকে জানতে পার-লাম যে, ওদের মধ্যে কেউ কেউ জাহাজ চালাচ্ছে আর কেউ কেউ জাহাজ চালানো শিখছে।

হোটেলের কোন লোক কোন দিন আমার মা-বাবা আছে কিনা বা আমার বাড়ি কোথায় এর কোন কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। আমিও নিজে থেকে কিছু বলতে যাইনি। একদিন মাত্র হোটেল-ওয়ালা বলেছিলেন, "হ্যাঁরে, তোর কি মা-বাপ বেঁচে আছে?"

প্রশ্নটা শুনেই আমার দিলে চমকে গেলো।

কারন এখন যদি আমি বলি যে, আমার মা-বাবা বেঁচে আছে। তাহলে উনি আরও হয়তো প্রশ্ন করবেন। আমার তখন সব সত্য কথাই বলতে হবে। কেননা আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সব সময় সত্য কথা বলবো। তখন মনে মনে বললাম," যা থাকে কপালে। সত্য কথাই বলবো।"
আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আবার বলে উঠলেন," কিরে, চুপ করে আছিস কেন? তোর মা-বাবা কি বেঁচে নেই?"
আমি তখন হাঁ করে বলে ফেললাম," হ্যা আছে।"
আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, উনি আমার উত্তর শোনা মাত্র চুপ করে গেলেন।

আমাকে আর কোন প্রশ্নই করলেন না। হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন মা-বাবা যখন বেঁচে আছে তখন দরিদ্রতার জন্যই আমি ঘর থেকে বের হয়েছি। আমি আর ওনার সামনে দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের কাজ শুরু করে দিলাম। নিজের কাজ ঠিক মত। যত্ন সহকারে নিজ হাতে করি।

এই হোটেলে ১০ দিন কাজ করলাম ভাল ভাবেই। আমার কাজ দেখে হোটেল ওয়ালা খুবই খুশী হলেন। এতই খুশী হলেন যে, খুশীর চোটে তিনি বলেই ফেললেন, "তোমাকে আরও ১০০ টাকা বেশী, অর্থাৎ ৪০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে।"

ওনার কথায় আমিও খুব খুশী হলাম। তখন আমি আবার দ্বিগুন উৎসাহে কাজ শুরু করে দিলাম। কিন্তু হোটেলওয়ালা বেশী দিন আমার প্রতি খুশী হয়ে থাকতে পারলেন না। একটা ঘটনার পর তিনি আমার প্রতি অখুশী হয়ে গেলেন। সেই ঘটনাটিই এবার আপনাদের কৌতুহল দূর করার জন্য উল্লেখ করছি।

একদিন একজন খরিদ্দারের সাথে ঝগড়া পাকালাম, ওনার ভীষণ পেট ব্যাথা করছে। তখন উনি খাবার খাচ্ছিলেন। খাবারের দোষ দিয়েই চলে গেলেন ওনার জায়গায়। আর কেউ না বুঝুক হোটেলের লোক, অর্থাৎ

আমরা ঠিকই বুঝেছিলাম কি কারনে নাবিক-টার পেট খারাপ করছিলো। আমাদের হোটেলের খারাপ পানি খাওয়ার দরুন ওনার এই অবস্থা হয়েছে। আমার কিন্তু লোকটার জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছিল। (আল্লাহ্ না করুন) অবস্থা যদি খারাপের দিকে মোড় নেয়, তাহলে তো তার জন্যে আমরাই দায়ী। দোষটা হয়তো আমারই বেশী। কেননা, আমি ব্যাপারটা জেনেও সব লোককে হুশিয়ার করে দেইনি। সবাইকে বলে দেইনি যে, এই হোটেলের খাবার পানি খারাপ। হোটেল ওয়ালা ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করলেন। আমাকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে

খিদের মুখে উনি বলে উঠলেন, "কিরে দাড়িয়ে আছিস কেন ? কাজ কর।"
আমি আর দাড়িয়ে না থেকে কাজ করতে লাগলাম।

আরেকদিন অন্য আরেকজন নাবিক হোটেলওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "চাচা, আপনার হোটেলের পানি যেন কি রকম। অন্য হোটেলের পানির স্বাদ এক রকম, আর আপনার হোটেলের পানির স্বাদ অন্য রকমের। ব্যাপার কি বলুনতো।"
হোটেলওয়ালা ওনার কথার উত্তরে বললেন, "কি করব বাবু। আজকাল টিউব-ওয়েলের পানিও খারাপ হয়ে গেছে।"

হোটেল ওয়ালার এই মিথ্যা কথা শুনে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ~~তখন~~ ওনার এই মিথ্যা কথার প্রতিবাদ জানিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, " উনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনারা জানেন না, আপনাদের এই হোটেলে কিসের পানি খাওয়ানো হয়। আপনারা এই হোটেলে পুকুরের পানি খেতে পান।" আমার এই কথা শোনা মাত্র সব লোক উঠে দাঁড়ালেন। একজন পাবলিক হোটেল ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, " ছাঃ, আপনাকে আমরা বিশ্বাস করতাম। তাই এই হোটেলে খেতে আসতাম। তার আপনি আমাদের মাথায় বাড়ি-

জানালেন।
হোটেলওয়ালা বললেন, "আমি কিছু জানিনা। আর ঐ ছেলেকেই জিজ্ঞেস করেন। ওই হয়তো আপনাদের পুকুর হতে পানি খাওয়াচ্ছে। কারন পুকুর টিউব-ওয়েল থেকে কাছে। কষ্ট এড়ানোর জন্য ও হয়তো তাই পুকুর হতে পানি এনে আপনাদের খাওয়াতো।"
আমি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, "মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা। আমি পুকুর থেকে পানি এনে খাওয়াবো কেন। আর আমি যদি পুকুরের পানি আপনাদের খাওয়াতামই তাহলে এই কথা আপনাদের বলে দিতাম না।"

আমার এই কথা সবাই বিশ্বাস করলেন। তখন একটা লোক বললেন, " চাচা আপনি বুড়ো মানুষ তাই আপনাকে কিছু বললাম না। কিন্তু আমরা কেউ আর আপনার হোটেলে খাব না।"

কথাটা উনি হোটেলওলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন। এই কথা শোনা মাত্রই হোটেলওলা সবার সামনে হাত যোড়া করে দাড়ালেন। তারপর বললেন, " বাবারা আমার খুব অন্যায় হয়েছে, আমি স্বিকার করছি আমার খুব অন্যায় হয়েছে। আমি লোভে পড়েই এই কাজ করেছি। আমাকে তোমরা মাপ করে দাও। জীবনে আর এমন কাজ করব না।"

ওনার এই অনুরোধ উপেক্ষা করেই সবাই হোটেল থেকে বের হতে লাগল। একজন লোক তো বলেই উঠলেন, " সে আমাদের অন্যায় করে সে সময়ে মনে ছিল না।"
আরেকজন বললেন, " হ্যাঁ, নিজে তো লাভ করবেই। তার উপর আবার ডাক্তারকেও লাভবান করাবে। আমাদের পুকুরের পানি খাইয়ে নিজে লাভবান হবে। পুকুরের পানি খাওয়ার ফলে আমাদের রোগ হবে। যার ফলে ডাক্তার লাভ-বান হবে। মাঝখান থেকে লোকসান যাবে আমাদের।"
এইরূপে আরও অনেকে নানা রকম বিদ্রুপ করতে লাগল। তখন একজন পথিক বল—

লেন, "তোমরা চুপ কর। চাচা নিজে থেকে যখন আমাদের কাছে মাপ চেয়েছেন, তখন আমাদের আর ওনার উপর রাগ করা চলে না। এস আমরা সবাই চাচাকে মাপ করে দেই।"

আরও কয়েকজন লোক ওনার এই কথাটিতে সমর্থন করলো। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে চাচাকে মাফ করে দিলেন। তখন চাচা আর দেরী না করে পুকুরের যত পানি ছিল, তা সব খেলোলের বিছানে নর্দমায় ফেলে দিতে বললেন। তারপর আমার হাতে কলস দিয়ে বললেন, "যা জলদি টিউব-ওয়েল থেকে পানি কিনে আন।"

ওনার এই কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম। ভাবলাম উনি অতি অতিই ওনার নিজ ভুল বুঝাতে পেরেছেন। কিন্তু ওনার মনের ভিতরে যে কি ছিল, তা আমি জানতে পারলাম না। সরল মনেই ওনার সব কথা মেনে যেতে লাগলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠলাম প্রতি দিনের চেয়ে আরও সকালে। হোটেলের প্রাথমিক কাজ করার পর যখন সূর্য্য পূর্ব আকাশে উঁকি দিল, তখন কয়লা দিয়ে দাঁত-~~মুখ পরিষ্কার করলাম~~ x মেজে আসলাম। তারপর পুকুরে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। কারও মুখে

করে দিলাম প্রতিদিনের মতো। কাজ করতে করতে সকাল যখন ৮টা বাজল তখন হোটেলওয়ালা আমাকে বললেন, "তোমার কাজ আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমি আজই বরং আমার হোটেল থেকে চলে যাও।" ওনার কথাগুলো মিছরীর ছুরির মতো আমার বুকে এসে বিঁধলো। আমি ওনাকে বললাম, "একদিন তো আপনি বলেছিলেন, আমার কাজ খুব ভাল। যার জন্য আপনি আমাকে ১০০ টাকা বেশীও দিতে চাইলেন। এখন আবার বলছেন আমার কাজ আপনার পছন্দ হচ্ছে না। এ কোন ধরনের কথা?"

—"তখন তোমার কাজ ভাল ছিল। এখন তোমার কাজ খারাপ হয়ে গেছে।"

—" এ আপনি কি বলছেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি জানতাম একটা লোকের কাজ প্রথমে খারাপ থাকে তারপর আস্তে আস্তে ভাল হয়। আমার বেলায় কি ঠিক তার বীপরীত হলো?"

—" তুমি আর কথা বাড়িও না। এই নাও পঞ্চাশ টাকা। টাকা নিয়ে সোজা তোমার পথ তুমি দেখ। আজ কোন খাবার সময় হোটেল থেকে নাস্তা খেয়ে যেও।"

আমি বুঝতে পারলাম কেন উনি আমাকে

হোটেল থেকে বিতাড়িত করছেন। তবুও আমি উনার প্রতি খুশী হলাম। কারণ উনি বললেন যে, যাবার সময় আমি যেন খাবার খেয়ে যাই। আমি আর উনার সাথে কথা বাড়ালাম না। উনার কাছ থেকে পঞ্চাশটি টাকা নিলাম। তারপর হোটেল থেকে ২ খাবার খেয়ে কিছু-দিনের স্মৃতি বিজড়িত এই হোটেল থেকে বিদায় নিলাম।

কিছুদূর যাবার পর ভাবলাম, হুজুরের কাছে কি একবার যাব? আবার পরক্ষণেই ভাবলাম হুজুরকে আর

বিরক্ত করেছি আর না। এখন আবার জায়গা বদল করতে হবে। এই ভেবে আবার চলে এলাম পাহাড়পুর রেল ষ্টেশনে। সেখান থেকে ঢাকাগামী একটা ট্রেনের ছাদে উঠে বসলাম। কিছুক্ষন পরই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আস্তে আস্তে ট্রেনের গতি বাড়তে লাগল। এক সময় দেখলাম ট্রেন দ্রুত গতিতে চট্টগ্রামকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমি শেষ বারের মত চট্টগ্রামের সৌন্দর্য ভাল ভাবে দেখে নিলাম।

রাত ১০টার সময় ট্রেনটি ঢাকায় পৌঁছালো। আমি আর সামনের দিকে গেলাম

না। টিকিটেই নেমে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম আর মাত্র ৩০ টা টাকা রয়েছে। বাকী ২০ টাকা খাওয়ার জন্য ব্যয় হয়েছে। আমি আর টাকার কথা চিন্তা করলাম না। চিন্তা করতে লাগলাম, যেখানে ঘুমাবার মতো কিভাবে একটা জায়গা পাওয়া যায়। আমি দেখলাম চিন্তায় কোন কাজ হবে না, আমাকে চেষ্টা করতে হবে। তাই আমি চেষ্টা করে দেখতে লাগলাম কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু আমার চেষ্টাই বৃথা হলো। স্টেশনে এত পরিমান লোক জমেছিল যে, তাতে তিল ধারনের স্থান হয়তো হতে পারে কিন্তু

মানুষ থাকার স্থান কোথাও নেই। অনেক কষ্ট করার পর একটা জায়গা পেলাম, যার উপরে খোলা আকাশ। অর্থাৎ তাতে কোন ছাউনি ছিল না। তবুও এই রকম একটা জায়গা পেয়েছি এটাও তাই ভাগ্য। আমি আর দেরী না করে গায়ের গামছা খানি দিয়ে ধূলা-বালি সরিয়ে ফেললাম। তারপর গামছাটা পেতে তার উপর শুয়ে ফেললাম। পিঠের নিচের উঁচু অংশগুলো আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল। কারণ আমার শোবার জায়গাটা ছিল অসমান। তবুও বাধ্য হয়ে কষ্ট করতেই হবে। কেননা এর চাইতে ভাল জায়গা খালি নাই।

আকাশে তখন অসংখ্য তারা উঠে-ছিল। আমি এক দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইলাম। আমার দুর্ভাগ্য কষ্টদায়ক হলেও, আকাশের পানে চেয়ে আমার মনটা একটু স্বস্তি পেল। আকাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখন নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা টেরও পেলাম না।

ঘুম থেকে উঠলাম খুব সকালে। তারপর হাত-মুখ পরিষ্কার করে নিলাম। কিছুক্ষণ স্টেশনে বসে থাকার পর যখন মনে করলাম এখন দোকান-পাট খোলা শুরু করেছে তখন স্টেশন থেকে বের হলাম। উদ্দেশ্য কোন কাজ পাওয়া।

কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি নির্দয় হলো। কোন কাম খুঁজে পেলাম না। এমনকি দুই দিন খোঁজা-খুজির পরও কোন কাম আমার হাতে এল না। পকেট তখন আমার একেবারে শূন্য। এই দুই-দিনে খাওয়ার জন্য ৩০ টাকা খরচ হয়েছে। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। এখন কি করা যায়? ভাবনাটা জোর করেই মাথা থেকে সরিয়ে ফেললাম। কেননা এখন আমার ভাবার সময় নেই। আমাকে যে করেই হোক একটা কাম খুঁজে বের করতেই হবে। এইভেবে আবার কাম খোঁজা শুরু করে

দিলাম। কিন্তু রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ খুঁজেও কোন কাজ পেলাম না। তখন ভগ্ন প্রায় মন নিয়ে স্টেশনে চলে এলাম। আমার ভাগ্য ভাল স্টেশনে আমার সাথে সাথে ঘুমা-নো জন্য একটা সুন্দর জায়গা পেয়ে গেলাম। সুন্দর জায়গা মানে আপনারাই-তো বুঝতে পারছেন। আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। সাথের সাপ্তাহিকখানা বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লাম। কাজটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি-ই করলাম। কারন দেরী করলে হয়তো জায়গাটা অন্য কোন লোকে দখল করে নেবে। আর একবার যদি তারা জায়গাটা দখল করে

পারে তাহলে ও আর সহজে ছাড়বে না। এই স্টেশনে জায়গা পেতে হলে সন্ধ্যা থেকে চেষ্টা করতে হয়। আর ভাগ্য ভাল তাই জায়-গাটা পেতে বেশী কষ্ট করতে হয়নি। তাও যদি হেলায় নষ্ট করি, তাহলে আর কোন উপায় থাকবে না। ভাল জায়গা পেয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম।

ঘুম থেকে উঠে স্টেশনের পাশের সেই কল থেকে হাত-মুখ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে গেলাম। হাত-মুখ পরিষ্কার করে স্টেশনের ভিতরের একটা বেঞ্চিতে এসে বস-লাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটা ট্রেন

এসে স্টেশনে থামলো। ট্রেনটি থামার সাথে সাথে অনেক লোক ছুটে দৌড়ালো ট্রেনটিতে ওঠার জন্য। তাদের অনেকের হাতেই ছিল দড়ি। আমি জানতাম তারা এই দড়ি দিয়ে কি করে। তারা ঝাড়গ্রাম স্টেশনের অদূরে গাবেন্দ্রপুর, মধুপুর, প্রভৃতি জঙ্গল এলাকায় গিয়ে খড়ি বা জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করে। তারপর তা বিক্রী করার পর যে দুই-চার পয়সা তাদের আয় হয়, তাতে তাদের মোটা-মুটি ভাবে খাওয়া খরচটা চলে। আমি ঠিক করলাম আমিও ওদের সাথে যাব। মনে মনে এই ঠিক করে আমি ট্রেনের ছাদে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি ছেড়ে দিল।

এক সময় ট্রেনটি জঙ্গলের এলাকায় ঢুকে পড়লো। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম শুধু গাছ ~~গাছ~~ আর গাছ। গাছকে আমি চিরকালই ভালবাসতাম। তাই এত ঘন গাছ দেখে আমার খুব ভাল লাগল। মনে মনে ঠিক করলাম আমিও এ দেশকে গাছে গাছে ভরে তোলার একটা চেষ্টার আন্দোলন নেব। আমি জঙ্গলের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে এক সময় অনুভব করলাম ট্রেনের গতি আস্তে হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম ট্রেন এখন থামবে।

যখন ট্রেন রামেশ্বরপুর থামলো, তখন অনেকেই ট্রেন হতে নেমে পড়তে লাগ-

লেন। তাদের ভিতরে যারা ঘড়ি নিতে এসে-
ছেন তারাও আছেন। আমি আর বিলম্ব
করলাম না। ওনাদের (যারা ঘড়ি নিতে
এসেছেন) পথ অনুসরণ করে নেমে পড়-
লাম। নেমেই দেখতে পেলাম, পাঁচটি আমার
বয়সি ছেলে ঘড়ি হাতে নিয়ে রাম-
পুকুর খাল পাড়ের ভিতরে ঢুকছে। আমি
আর বিলম্ব না করে ওদের পেছন
পেছন চলতে লাগলাম। আমি যে ওদের
~~পিছু~~ পিছন পিছন চলছি তা ওরা টেরই
পেল না। অনেকক্ষণ পরে আমি
ওদের সামনে পড়লাম। তখন একটা ছেলে
আমাকে প্রশ্ন করলো, "তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

আমি উত্তর দিলাম, " তোমরা যেখানে যাচ্ছ, সেখানে। "

— " আমরা তো যাচ্ছি খড়ি আনতে।"

— " আমিও যাচ্ছি সেখানে।"

— " কিন্তু তোমার দাত্রি কৈ ?"

— " দাত্রি নাই।"

— " তবে কি করে খড়ি নেবে।"

— " কেন, কলাগাছের কোৎকা* দিয়া।"

—*—*—

কোৎকা* হল কলাগাছের একটা অংশ। যার সাহায্যে দড়ির কাজ করা যায়।

—"তাহলে তুমি আমাদের সাথে যেতে পার"।
আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। পেটে তখন প্রচণ্ড খিদে। খিদেকে সরিয়ে দিলাম দূরে, কষ্টকে নিয়ে এলাম কাছে। অর্থাৎ আমি কষ্ট সহ্য করেই পথ চলতে লাগলাম। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ের দরজা আমার জন্য খোলা ছিল না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, যদি খড়ি নিয়ে বিক্রী করতে পারি তাহলে সেই টাকা দিয়ে কিছু কিনে খেতে পারবো। আমার মনে সন্দেহ ছিল, খড়ি নিয়ে বাইরে বিক্রী করতে পারবো কিনা।

আমি এদের দলে আসায় মোট

চিন্তিত হলাম। দুইটি ছেলে প্রায় একই বয়সের। কিন্তু কারও সাথে এর আগে আমার পরিচয় হয়নি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ওরা আরও অনেকবার এই বনে খড়ি নিতে এসেছে। কিন্তু আমি এলাম জীবনে এই প্রথম। তাই এত গভীর বন দেখে আমার ভয় ভয় করতে লাগল। ওদের দিকে চেয়ে দেখলাম, ওরা নির্বিঘ্নে হেঁটে যাচ্ছে। তাই আমার ভয়ও কিছুটা কমে গেল। বনে শাল গাছগুলো এত ঘন হয়ে জমেছে যে, দিন হওয়া সত্ত্বেও সব-কিছু ভাল-ভাবে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে যান গেছের উপরে খোলা আকাশ

থাকায় সেখানেই মাত্র সূর্যের আলো এসে পড়ে। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ধান ক্ষেতের জমিগুলো এখানকার স্থানীয় লোকদের। অর্থাৎ এই বনে যে স্বল্প কয়জন লোক বাস করে তাদের। আমি ও আমার সাথের ছেলেরা বনের ভিতরে সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর আমি ওদেরকে নানা রকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করছি। রাস্তার (সরু পথ) দুই পাশেও ছিল উঁচু উঁচু ঝাউগাছ। কিছুদূর হাঁটার পর এখানকার স্থানীয় লোকদের লাগানো একটা কলাগাছ হতে কিছু কোয়া ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর ওরা খড়ি সংগ্রহ করতে চলে গেল। ঝরে যে সব ডাল গাছের ডাল-পালা পড়ে গেছে, অথবা কোন লোক গাছ কেটে শুধু কান্ডটা নিয়ে গেছে আর ডালপালা রেখে গেছে, আমরা এমনি সব খড়ি যোগাড় করতে লাগলাম। আমার পেটের অবস্থা তখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। আমি আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারছিলাম না। তবুও অনেক কষ্ট করে সহ্য করতে লাগলাম। কিছু-ক্ষন পর ক্ষুধার জ্বালায় আমার মাথা ঘুরতে লাগল। তখন সাথের ছেলেদের

উদ্বেগ্ন করে বললাম," আমার খুব খিদে লেগেছে। এখন উপায় কি?"
একটা ছেলে বললো," কি আর করবে, সহ্য করে যাও।"
-"সহ্য যে আর করতে পারছি না।"
—"সত্যিই কি তোমার খুব খিদে লেগেছে?"
—"হ্যা সত্যিই খুব খিদে লেগেছে।"
—"তাহলে তুমি খাটি খোঁজা বন্দ দাও। দেখ ধারে কাছে কোথাও ঘর-বাড়ি পাও কিনা। এখানকার লোক-জন খুবই ভাল। তুমি তোমার সমস্যার কথা জানালে তারা নিশ্চই তোমাকে কিছু খেতে দেবে।"
এই বলে সে আমাকে একটা পথ দেখিয়ে

দিল। আমি আর দেরী না করে সে পথে রওনা দিলাম।

আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই। কিন্তু কোথাও কোন ঘর-বাড়ি দেখতে পেলাম না। শুধু গাছ আর গাছ। গাছ আমার কাছে এত প্রিয় হওয়া সত্বেও এই সময়ে সে আমার কাছে অপ্রিয় হয়ে গেল। কারন হলো আমার পেটে এখন প্রচন্ড ক্ষিদা। আমার মনে পড়ে গেল উইলিয়ম সি ব্রায়েন্ট এর একটি উক্তির কথা। তিনি বলেছেন, " খালি পেটে কেউ কোন দিন স্বদেশ প্রেমিক হতে পারে না "। আমার মতে বাক্যটা এভাবে প্রযোজ্য, " খালি পেটে কেউ

কোন দিন সৌভাগ্য প্রিয় হতে পারে, না"। আনুমানিক এক মাইল মত হাঁটার পর দূরে বাড়ির মত কিছু একটা দেখতে পেলাম। আর কিছুদূর যেতেই সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারলাম ওটা একটা বাড়ি। মনে হওয়ায় যে আমি আমার প্রাণ ফিরে পেয়েছি, এমনিভাবে লাফিয়ে উঠলাম। আরও জোরে জোরে পা চালিয়ে, বলতে গেলে এক-রকম দৌড়াতে দৌড়াতেই বাড়িটার কাছে গেলাম। বাড়ির সামনে দেখতে পেলাম একটা টিউব-ওয়েল। আমি তাড়াতাড়ি করে টিউব-ওয়েল থেকে কিছু পানি খেয়ে নিলাম। খালি পেটে পানি খাওয়ার দরুন

মাথাটা আরও বেশী ব্যথা করতে লাগল।
আমার বয়সি একটা ছেলেকে দেখতে পেলাম,
বাড়ির সামনে একটা গাছ তলায় দাড়িয়ে
আছে। আমাকে দেখা মাত্রই সে বলে
উঠলো, " তুমি কে এখানে কি মনে এসেছ?"
আমি ওর কথার উত্তর দিলাম এই বলে,
" আমি এই বনে এসেছিলাম খড়ি যোগাড়
করার জন্যে। কিন্তু গতকাল থেকে কিছু
না খাওয়ার দরুন আমার শরীর ছিল
খুবই ক্লান্ত। তাই আমার আর খড়ি
যোগাড় করা হল না। আমার মাথা
ফেলেছে একটা পথ দেখিয়ে বললো আমি
কোথাও কোন খড়ি পেলে বাড়ির লোকে

কাছে আমার সমস্যার কথা বললে তারা কিছু খেতে দেবে। সেই ভরসাতেই এখানে এসেছি। আমি আর কথা বলতে পারছি না। খিদের জ্বালায় আমার মাথা ঘোরা করছে।"

—"তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।"

এই বলে সে বাড়ির ভিতর চলে গেল। আমি সেই গাছ তলায় বসে পড়-লাম। দাঁড়াবার শক্তিটুকুও আমার দেহে অবশিষ্ট ছিল না। কতক্ষণ বসে থাকার পর ঐ লোকটিকে আমার কাছে আসতে দেখলাম। তার হাতে দেখতে পেলাম কয়েকটা রুটি আর এক প্লেট

ভাজির মতো কিছু একটা জিনিস। আমার কাছে এসে ও বললো, "এই রুটি কয়টা খেয়ে নাও।"
আমি তার সাথে কথা না বাড়িয়ে রুটি কয়টি খেতে শুরু করে দিলাম। আমার কাছে খাবার দিয়ে ঐ মেয়েটি আবার যেন কোথায় চলে গেল। আমার যখন খাওয়া শেষ হলো, তখন ও আমার সামনে কয়েকটি পেয়ারা দিয়ে বললো, "এ গুলি খাও।"
আমি পেয়ারাগুলো হাতে নিয়ে বললাম, "পেয়ারা পেলে কোথায়?"
– "আমাদের গাছের পেয়ারা।"
আমি পেয়ারায় কামড় বসিয়ে দিয়ে বললাম, "খুব মিষ্টি পেয়ারা তো।"

-" এ আমার নিজ হাতে লাগানো গাছের পেয়ারা।"
-"তাই নাকি!"
-"হ্যাঁ। তোমাকে কি আরও কয়েকটা পেয়ারা এনে দেব।"
-"না থাক, অনেক হয়েছে।"
-"না, আমি বুঝতে পারছি। তোমার এখনো খিদে মেটেনি। আমি বরং আর কয়েকটা পেয়ারা নিয়ে আসি।"
এই বলে সে আবার চলে গেল। কিছুক্ষণ পর নিয়ে এল লুঙ্গি ভর্তি করে পেয়ারা। আমি বললাম, " এত পেয়ারা দিয়ে কি করবো।"
-" কি আর করবে, খাবে।"
-" এতগুলো খাব আমি! না এ আমি

পারবো না।"

—" তোমাকে পারতেই হবে।"

—" না পারব না।"

—" পারতেই হবে।"

—" দেখ আমার পেট ভরে গেছে। আর অল্প কিছুও খেলে আমার পেট ফেটে সব কিছু বের হবে আমার।"

—" তবুও তোমাকে খেতে হবে।"

অগত্যা কি আর করা। যে নাছোড়-বান্দা ছেলের হাতে পড়েছি তাতে আর না খেয়ে পারা যাবে না। তাই কষ্ট হলেও এক একটা কোরেই খেতে লাগলাম। না, আমি নিজে নই, ওই আমাকে খাওয়াতে লাগল। কারন যেখানে আমার হাত দুটো

মুখ বলছে, "না না, আর না।" তখন ও বলছে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও খাও।" তখন আমি নিজেও খেলেও বুঝতে হবে, ওই আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে। এমনিভাবে সকল শেষ সব পেয়ারাই আমাকে খাইয়ে ছাড়লো। সব পেয়ারা-গুলো খাওয়ার পর ও জিভের ভিতর থেকে একটা আঁটি এনে বললো, "এখানে বসে বিশ্রাম নেও।"

আমি ওকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। বুঝতে পারলাম, জংলী পাখোয়ারা হলেও উপস্থিত জ্ঞান আছে। এই সময় যে আমার বিশ্রামের প্রয়োজন তা ঠিক ও বুঝতে পারলো। আমি আর দেরী না করে আঁটিতে

বসে অন্য একটা আদের সাথে খেলায় দিলাম। কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন বন্ধু মহিলা এলেন। ওনারা এসে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন। আমার ভাগ্য ভাল যে, ওনারা এমন কোন প্রশ্ন করলেন না, যাতে আমার মিথ্যা কথা বলতে হয়। সুতরাং ওনাদের সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারলাম। আমাকে যে মেলবী ধারার দিয়েছিল, সে একসময় কথা প্রসঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইলো, "তুমি কি কোন কাজ করবে?"

আমি উল্টো ওকে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ধরণের কাজ?"

—" এই ধর গৃহস্তের কাজ।"
—"হ্যা করতো। কিন্তু কোথায়?"
—" আমার পরিচিত একটা গৃহস্তের একটা লোকের প্রয়োজন ছিল। তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন তোমাকেই বরং তার কাছে নিয়ে যাই। কি বলো?"
—" তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"
—" তাহলে দুপুরে খাওয়া, দাওয়া সেরে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে ধীরে-সুস্থে রওনা দেয়া যাবে।"
—" ঠিক আছে।"
—" তুমি কি আজ গোসল করেছ?"
—" না।"

— " তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি তোমার জন্য লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে আসি।"

এই বলে সে আমাকে দাঁড় করিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা লুঙ্গি আর একটা গামছা নিয়ে ফিরে এল। আমাকে ও গুলো দিয়ে বললো,

" এই নাও লুঙ্গি আর গামছা। আমার সাথে আসো। তোমাকে পুকুরটা দেখিয়ে দেই।"

আমি ওর সাথে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ও আমাকে পুকুরে দেখিয়ে বললো, " এখানে গোসল করে নাও। আর সাবধানে হাঁটে যেয়ো। তা নাহলে

পিছলে গিয়ে হাত-পাও ভেঙ্গে ফেলবে।" এই বলে সে একটা গাছতলায় দাড়িয়ে রইলো। যখন আমার গোসল করা-শেষ হলো তখন সে আমাকে ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর দুজনে মিলে অনেক বিষয়ের গল্প করলাম। যখন দুপুরে খাওয়ার সময় উপস্থিত হলো, তখন ~~বাড়ির~~ ঘরের ভিতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন বলে উঠলো, "নাসির ঐ ছেলেটিকে নিয়ে খেতে আয়।" আমি বুঝতে পারলাম আমার সাথের ছেলেটার নাম নাসির। এই কথা শোনা মাত্র সে আর দেরী করল না। আমাকে

নিয়ে গেল অন্য আর একটা ঘরে।
কিছুক্ষণ পরেই আমার সামনে খাবার হাজির করা হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ ছেলেটি আমাকে একটা বিছানায় শুয়ে দিল। ওর আদর-যত্ন এমন যে, আমি ভীষণ অবাক্ । তাই ও আমার সেবা-শুশ্রূষা করছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর ওর সাথে সেই গৃহস্থ পরিবারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছানোর পর ও বাড়ির কর্তার কাছে আমাকে হাজির করলো। বাড়ির কর্তাকে ও বললো, "চাচা এই ছেলেটি কাজ করতে চায়। আপনি

বলছিলেন না, আপনার কাজের দরকার। তাই এ'কে নিয়ে এসেছি।"
কর্তা অনেক ধরে আমাকে দেখলেন। তার-পর জিজ্ঞেস করলেন, "আগে কোন দিন গৃহস্থের কাজ করেছ?"
আমি উত্তর দিলাম, "জি, না।"
– "এ কাজ সহ্য করতে পারবে তো।"
– "হ্যাঁ পারবো।"
–" আপাতত তোমাকে আমি পেটে-ভাতে* রাখলাম। কিছুদিন কাজ করার পর যদি কাজ শিখতে পার তাহলে তোমাকে বেতন দেওয়া হবে। তুমি কি এতে রাজী?"

পেটে ভাতে* হলো কাজের বিনিময়ে শুধুমাত্র খাবার আর পোশাক। বেতন নাই।

— " হ্যাঁ, আমি রুমি "।
— " তাহলে আমার কাছে তুমি থাকতে পার "।
তারপর আমার সাথের ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, " নাসির, তুই কিন্তু চলে যাইসনা। কত দিন পর এসে ছিস একদিন থেকে যাইস।"
নাসির বললো, " না চাচা, বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আমি না গেলে তার একটা কাজও আগাবে না।"
এই বলে নাসির রওনা দিল। কর্তা ওকে যেতে দেখে বলে উঠলেন, " সে কিরে এখনই যে যাচ্ছিস। অত দূর থেকে এসে-ছিস একটু জিরিয়ে যা।"
— " না চাচা, আজ আর জিরোবার সময় নেই। আর একদিন এসে জিরিয়ে যাবানে।"

এই বলে সে চলে গেল। আমি চাঁই পেলাম।

সে দিন আমার কোন কাজ করতে হল না। কারণ দিন তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাড়ির কাদা-কাদি ঘোড়া-ঘুড়ি করে দিনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দিলাম। রাতের খাবার সময় হলে আমাকে খেতে দেওয়া হলো। খাবার খেয়ে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাদুরটি অবশ্য বাড়ির লোকেরাই দিলেন। মশার অনেক কিছু সহন করে ঘুমিয়েও পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পুকুর থেকে

হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। তারপর কর্তার সাথে চলে গেলাম মাঠে কাজ করতে।

জীবনে কোন দিন মাঠের কাজে হাত দেয়নি। তাই আমার কাছে এই কাজটি প্রথমে খুবই কষ্টের কাজ বলে মনে হলো। কিন্তু-মান কাজ করার পর কষ্টটা একটু কমলো। প্রথম দিন আমার কাজ ছিল কোদাল দিয়ে লেতের চারি-পাশ পরিষ্কার করা। আমি আমার কাজ করে যেতে লাগলাম। যখন সকালের খাবার সময় হলো, তখন বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে হাজির হলেন কর্তার এক-

মাত্র ছেলে। ওর নামটা এখন অবশ্য আমার মনে পড়ছে না। আমরা খাবার পেয়ে খুব খুশী হলাম। বিশেষ করে আমি। হাত-মুখ বাটি থেকে অল্প একটু পানির সাহায্যে পরিস্কার করে ফেললাম। তারপর খেতে গেলাম। খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আবার ওদের কথা স্মরন করে দিলাম। কিছুক্ষন পর রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত পরিমানে বেড়ে গেল। রৌদ্রের তাপে আমার শরীর থেকে এক নাগাড়ে ঘাম ঝরতে লাগল। তবুও আমাকে শক্ত হয়ে সব সহ্য করে তাকে আর যেতেই হবে। তাই কষ্ট সহ্য

কাজেই কাম করে যেতে লাগলাম। যখন দুপুরের খাবার সময় হলো তখন আমি আর কর্তা বাড়ি গেলাম। তারপর পুকুর থেকে গোসল করে নিলাম। আমার অতিরিক্ত কোন লুঙ্গি ছিলনা। তাই-উনার একটা লুঙ্গি আমাকে পড়তে দিলেন। গোসল করার পর আমাকে খাবার দেয়া হল। খাবার খেয়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আবার মাঠে চলে এলাম। কর্তা আমার-সাথে এলেন না। কারন, তখন সূর্যের প্রচন্ড তাপ ছিল। সেই তাপে রক্ত মাংসে গড়া মানুষের কাম করা খুবই কঠিন। কর্তা হয়তো ভেবেছেন আমি রক্ত মাংসে

গড়া মানুষই না। তাই আমাদেরই পাঠিয়ে দিলেন মাঠে কাজ করার জন্যে। আমি আর কি করবো। যখন উনার কাজ করছি তখন উনার কথা শুনতেই হবে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে আমি আমার বাকী কাজ শুরু শেষ করতে লাগ-লাম। যখন সূর্যের তাপ কমলো, তখন কর্তা মাঠে এসে হাজির হলেন। কিন্তু কোন কাজ করলেন না। আমাদের শুধু এটা কর, ওটা কর ইত্যাদি বলে কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমিও উনার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে গেলাম। কাজ করতে করতে এক-

অবশেষে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। তখন কর্তা আমাকে কাজ বন্ধ করতে বল-লেন। আমি কাজ বন্ধ করে কর্তার সাথে বাড়ি চলে এলাম। তারপর খাবার সময় হলে অন্যদিনের মত খেয়ে দেয়ে আমার বারান্দার মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার অল্প কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়েও পড়লাম। আর ঘুমটা একটু তাড়াতাড়িই হলো। কেনন সারা দিনটা রোদে খাটুনির উপর।

ঘুম থেকে উঠে অন্য দিনের মত হাত-মুখ পরিষ্কার করে কর্তার সাথে

আমার জামের ২য় মাঠে চলে গেলাম। আমার আজকের কাজ হলো লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা। আমি জীবনে কোন দিন লাঙ্গল হাতে ধরিনি। তাই লাঙ্গল ধরার সাথে সাথে আমার মনের ভিতর কেমন কেমন যেন করতে লাগল। কর্তা ছিলেন আমার সামনে। উনি আর একটা লাঙ্গল নিয়ে জমি চাষ করে চললেন। আগেই তো আমার লাঙ্গল ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাই আমি আর বিলম্ব না করে ওনার পিছন পিছন লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে চললাম। কিছুক্ষণ পর একটা

ছেলেকে দেখতে পেলাম খাবার নিয়ে আমাদের এ দিকেই আসছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ ছেলেটা কর্তারই একমাত্র ছেলে। ও যখন আমাদের কাছে এল, তখন কর্তা আমাকে কাজ বন্ধ করতে বললেন। আমি কাজ বন্ধ করে ওনার সাথে হাত-মুখ পরিষ্কার করে খেতে বসলাম। আমরা খেতে বসলাম একটা গাছতলায়। বাইরে বসে খাওয়ার একটা অন্যরকম তৃপ্তি আছে। সাধারন খাবারকেও অনেক স্বাদের মনে হয়। তাই সাধারন ডাল-ভাত খেয়েও আমার মনে হলো আমি যেন রেস্টুরেন্টের খাবার খাচ্ছি। আমি বুঝতে

পারলাম নিজেরাই শুধু স্বাদ অনুভব করতে পারলাম না। স্বাদ অনুভব করবার জন্য আর ও একটি বস্তু জিনিস রয়েছে। যার নাম মন। এই মনের কারণেই স্বাভাবিক খাবার আমার কাছে এত সুস্বাদের মনে হতে লাগল। কারণ আমি যেখানে বসে খাবার খাচ্ছি তার চারপাশে মানের জন্য অনেক সুস্বাদু খাবার রয়েছে। এই মনের খাবারের জন্যই নিজের খাবারকে আমার কাছে সুস্বাদু মনে হলো।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা আবার সব জমি চাষ শুরু করে দিলাম। এবারও আমি কর্তার পিছন পিছন জমি চাষ

করে চললাম। এই সময়ে একটা হাস্য-কর ব্যাপার ঘটলো। পাঠকগণের কৌতু-হল নিবারনের নিমিত্ত একার সেই ঘট-নাটিই উল্লেখ করছি।

আমি কর্তার পিছন পিছন জমি চাষ করে চলেছি। হঠাৎ আমার হালের গরু দুটো আমার কথা না শুনে লাঙ্গল শুদ্ধ জমি থেকে জঙ্গলের মধ্যে উঠে গেল। আমি কর্তার পিছন পিছন ছিলাম বলে কর্তা এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন না। মোড় ঘুরতেই যখন তিনি দেখলেন, আমি ওনার পিছনে নেই, তখন খুব ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু কিন্তু করে কি যেন লাজ

বুকে ফুঁ দিলেন। তারপর আমার
নাম ধরে ডাক দিলেন। আমি মারা যাও-
য়ার পর আমার গরু দুটো সহ খাদান
থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।
তারপর আলাদা করে একটা ধমক দিয়ে
বললেন, "যে সময় গরু দুটো খাদানে
মধ্যে ঢুকতে দিল সে সময়ে তুমি আমাকে
ডাক দিলি না কেন?"
— "বাবা, আমি তখন গরু দুটো ঠেকাতে
না আপনাকে ডাক দেবো।"
— "আমি এখন বুঝতে পারছি। এ প্রেত
শয়তানের কাজ।"
— "কি যে বলেন, এই বনে শয়তান

আসবে কোথেকে ?"

-" তুমি কি কচি খোকা নাকি। মানব এই-বনে শয়তান আসবে কোত্থেকে। এই বনেই তো শয়তান বেশী।"

-" আমি কিন্তু ভাই শয়তান বিশ্বাস করি না।"

-" তা করবা কেন, খাটি মুসলমান হলে ঠিকই করতে।"

আমি বুঝতে পারলাম ওনার সাথে কথা বলে কোন লাভ হবে না। তাই তখনকার মত চুপ করে রইলাম।

সেদিনের মত কর্তা ঐ পর্যন্তই-কথার ইতি টানলেন। আমি বুঝতে পার-লাম ভয়ের কারনেই তিনি এমনটি করছেন।

বাড়ি এসে উনি সব লোকের কাছে আর-জের এই ঘটনাটি ফলাও করে প্রচার করলেন। এই কথাটি কানে অবশ্যই-হাসার কথা। কিন্তু তারা একটুও হাসলেন না। বরং ঘটনাটি কানে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। কর্তা নিজে গিয়ে একটা ফকির মত লোককে কোথা থেকে যেন নিয়ে এলেন। ফকিরকে বললেন, “দেখ, আমার দোকানে এই বালক কর্মচারীর ক্ষ্যাপামি একটু কমেছিল। আবার তা উদ্ভব হয়েছে।”

ফকির এক হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, “কুছ পরোয়া নেই। এখনই আমি এই-

বন থেকে শয়তান তাড়িয়ে দিচ্ছি।"
এই বলে তিনি নানা রকম ভঙ্গিতে কি যেন সব বলতে লাগলেন। ওনার তন্ত্র মন্ত্র পাঠ দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ উনি ওনার মন্ত্র পাঠ করে বললেন, " আর কোন ভয় নেই। চিরদিনের মত শয়তান এই বন থেকে তাড়িয়ে দিলাম।"
তখন সবার মুখ হাসিতে ভরে গেল।
কর্তা ফকিরকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "চলেন আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।"
— "তাই চলো, বাবা।"
কর্তা তখন ফকিরের সাথে বাড়ির বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একা—

বাড়িতে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম না সাধারন একটা ব্যাপারকে এত বড় করে দেখার কি মানে হতে পারে। সে দিন আমার কোন কাজই করতে হলো না। না, না কাজ ছিল। সে কাজ হলো সবার কাছে তাদের ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরন দেওয়া। আর আমার ঘুমটা একটু দেরীতেই হলো। কারন রাতেও ওদের কাছে আমার বলতে হয়েছিল আসলেত ঘটনাটির কথা।

কিছুদিন কর্তার এখানে কাজ করার পর যখন মোটা মোটি কাজ শিখলাম তখন কর্তা একদিন বললেন, "হাতে, ভোরে একটা লোকে কাজ নিতে চায়। দেবে ১৫০০ টাকা। তুই কি এতে রাজী।"

আমি সম্মতি দিলে উনি আমাকে সেই লোক-টির কাছে নিয়ে গেলেন। সেই লোকটা কর্তার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। কর্তা আর ওনার কথা বার্তার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম, ওনার নাম রবিউল। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?"

— "মনির।"

— "বাড়ি কোথায়?"

— "বরিশাল।"

— "মা-বাবা আছে?"

আমি কিছুক্ষন চিন্তা করে উত্তর দিলাম, "হ্যা আছে।"

— "বাবা কি করেন?"

— "চাকরী করেন।"
— "তাহলে তুমি এ কাজ করতে এলে কেন?"
আমি অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলাম,
"জি, বাবার চাকরীটা অতি সামান্য তাই।"
উনি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।
পাঠকগন আপনারা হয়তো আমাকে বলবেন,
আমি মিথ্যেবাদী। কিন্তু আমি মিথ্যে
কথা বলিনি। অতি কষ্টে সত্যকে গোপন
রেখেছি মাত্র। আমার বাবার চাকরীতে
আমাদের পরিবারের সকলের খেয়ে দেয়ে
খুব ভাল ভাবেই চলে যায়। তবুও এমন
লোক আছে যারা আমার বাবার চেয়েও
বড় চাকরী করেন। আবার এমন লোক
আছেন যারা আমার বাবার চেয়েও ছোট

চাকরী করেন। যারা আমার লেভেল থেকেও বড় চাকরী করেন, তাদের কাছে হয়তো আমার লেভেল চাকরীটা অতি সামান্য। আমি সেই দিক দিয়েই ওনার কথার উত্তর দিলাম। তাই বলে আমার লেভেল চাকরীর থেকেও যারা ছোট চাকরী করেন, তাদেরকে আমি বলছিনে যে তাদের চাকরীটা অতি সামান্য। বরং তাদের চাকরীই আমার লেভেল চাকরীর থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সে যাই হোক আমাকে উনি কাজে নিলেন বডির হিসেবে। প্রতি রোজ ১৫০০ টাকা। কাপড়, খাওয়া-দাওয়া ওনার খরচে। কিন্তু আমি জানতাম যে,

আমার এই দীর্ঘ্য একটা বড়ো উনাড় প্রমাণ কার করা হবে না। কারন আমি বাসা থেকে বের হয়ে ছিলাম কয়েকদিন এই দেশ দেখার জন্য। তার মানে এই না যে, আমি আমার পড়া লেখার ইতি টেনে জীবনটাকে বরবাদ করে দেবো। তাই একদিন ঠিক করে ফেললাম রবিউল ভাইকে সব কথা বলবো। উনাকে আমি রবিউল ভাই বলেই সম্বোধন করতাম।

পরের দিন আমার সব কথা উনাকে খুলে বললাম। উনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আমার সব কথা শুনে একটুও রাগ করলেন না। বরং হেসে হেসে

বললেন," থাক বাবা, অনেক হয়েছে। এখন তুমি তোমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেও। তোমার মা-বাবা হয়ত তোমার জন্য চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে।"
আমি বললাম," তাহলে আজই রওনা দেই।"
—" সে কি! আজ কেন? আজ আমার এখানে বেড়িয়ে যাও। কাল ভোরের দিকে রওনা দিও।"
আমিও ওনার কথায় সায় দিলাম। সেই দিনটা কেটে গেল খুবই আনন্দের সাথে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম বাড়ির যাবার একটা

পুকুর থেকে। তারপর রবিউল ভাই-এর স্ত্রী আমাকে খেতে দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রবিউল ভাই- আমাকে ৭৫ টি টাকা দিয়ে বললেন, "আবার বেড়াতে এস।"

_"ইনশাআল্লাহ্ আবার আসবো।"

আমাকে বিদায় জানাতে রবিউল ভাই, ওর স্ত্রী, মা, এবং আরও অনেকে এলেন। আমি যখন ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তখন সবাই আমার জন্য দোয়া করলেন।

আমি কাল বন দেখতে দেখতে বনের ভিতরের সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এমনি ভাবে এক সময় গাজীপুর

রেল ষ্টেশনে পৌছে গেলাম। কিছুক্ষন পরই ট্রেন এলো। তখন কাউন্টার থেকে দশ টাকা দিয়ে একটা টিকিট কিনে নিলাম। টিকিট টা অবশ্য ঢাকা যাবার। তারপর ট্রেনে চড়ে বসলাম।

অল্প কিছুক্ষন পরই ট্রেন ছেড়ে দিল। এক সময় বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ট্রেন দ্রুত গতিতে মাঠ বন অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমার মনে হলো, ট্রেন দাড়িয়ে রয়েছে। মাঠ গাছ গুলো পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে। ১ঘন্টা পর ট্রেন কমলাপুর রেল ষ্টেশনে থামলো। আমি ট্রেন থেকে নেমে লোক জনদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলে গেলাম সদর ঘাটে। সদর ঘাটে এ দেশের বিভিন্ন জায়গায়

যাওয়ার জন্য লঞ্চ থাকে। আমি খোঁজ করতে লাগলাম বরিশাল যাওয়ার জন্য কোন লঞ্চ পাওয়া যায় কিনা। লঞ্চ পেলাম ঠিকই, কিন্তু ছাড়তে তখনও অনেক দেরী। তখন দুপুর হয়ে গেছে। আমার পেট জানিয়ে দিল আমাকে এখন কি করতে হবে। পেটের কথাকে আমি উচিত মনে করে চলে গেলাম একটা বেকারীতে। উদ্দেশ্য কিছু খাবার। বেকারী থেকে দুটো পাউরুটি কিনলাম। একটা সেখানে বসেই খেয়ে নিলাম। আর একটা রাখলাম লঞ্চে বসে খাওয়ার জন্যে। তার-পর লঞ্চের ছাদে উঠে সুচি গন্ধা নদীর অসংখ্য পাল তোলা নৌকা দেখতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে এক সময় লঞ্চ ছাড়ার বেল বেজে উঠলো।

বিকেল ৫টার সময় লঞ্চ সদর ঘাট থেকে ছেড়ে দিল। সে (লঞ্চ) তার ধীর গতি আপন গতি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। লঞ্চের একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আজ ২০ই সেপ্টেম্বর। বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম ১৭ই জুলাই। হিসাব করে দেখলাম আমার ভ্রমন করা হয়েছে ৬৫ দিন। সহজ হিসাবে বলতে গেলে বলা যায় ~~আমার~~ ২ মাস ৫ দিন। কিন্তু জুলাই আর আগষ্ট মাস ৩১ দিনের হওয়ায় আমার ভ্রমন করা হয়েছে ২মাস ৩ দিন। আর ভ্রমন

করতে ব্যয় হয়েছে ২৫০০ টাকা। না, ২৫০০ টাকা নয়। মাত্র ৯০০ টাকা। কারন কি? কারন তো আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনারাই তো তা জানেন।

ধীরে ধীরে রাত হয়ে এল। লঞ্চ হয়তো এখন ঢাকা থেকে অনেক দূর এসে গেছে। অন্ধকারের দরুন বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মধ্যে তারার মতো কতকগুলো ছোট ছোট আলো দেখা যাচ্ছিল। ওগুলো কতক্ষন পর নিভে যাচ্ছিল, আবার জ্বলে উঠছিল। লঞ্চের একটা পুলিশ এক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, " যাবে কোথায় ?"
—" বরিশাল।"

— "টিকিট নিয়েছ ?"
— "না।"
— "তোমার টিকিট নিতে হবে না। আমাকে ২০ টা টাকা দেও, তোমাকে তোমার স্থানে নামিয়ে দেবানে।"

আমি খুব খুশী হলে উনার কথায় রাজী হয়ে গেলাম। কারন আমার মনে হয়েছিল বরিশাল যেতে নিশ্চই ২০ টাকার বেশী দরকার। তাই উনাকে (পুলিশকে) ২০টা টাকা সাথে সাথে দিয়ে দিলাম।

আমার গন্তব্য স্থান বরিশালেই। কিন্তু বরিশাল সদর নয়। ঝিকারপুর লঞ্চ ঘাট। ঝিকারপুর লঞ্চ ঘাটটির পারের

স্টেশনটির নাম উজিরপুর। আমার বাবা বাড়ি হলো শিকারপুর আর দাদা বাড়ি হলো উজির-পুর। ঠিক করলাম শিকারপুরেই নামবো।
অকাল নয় টার সময় লঞ্চ শিকার-পুর ঘাটে থামলো। আমি ওতি যতি করে লঞ্চের সদর দরজার কাছে এলাম। দর-জায় কয়েকটা লোককে দেখলাম, যাত্রীদের টিকিট চেক করে নিয়ে তাদের লঞ্চ থেকে নামতে দিচ্ছে। পুলিশটি বলেছিল সে দরজার আশে পাশে থাকবে। কিন্তু অনেক খোঁজা - খুজির পরও তাকে পেলাম না। এদিকে আমাদের লঞ্চ ছেড়ে দেবার সময়ও হয়ে এসেছে। তাই বাধ্য হয়েই আস্তে আস্তে

দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। দরজার কাছে যে যাওয়ার সাথে সাথেই একটা লোক সাথে সাথে বলে উঠলো, "এখানে নামবে ?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যা।"

- "টিকিট কোথায়।"

- "টিকিট তো নাই।"

- "কোন জায়গা থেকে আইছ।"

- "ই ঢাকা।"

- "২০ টাকা দাও।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম ঢাকার আসল ভাড়াই ২০ টাকা। তবে লোকটাকে ২০ টাকা দিতে গেলাম কেন। মনে পড়লো একটা প্রবাদ প্রবচনের কথা। কথাটি হলো,

"অতি লোভে তাতি নষ্ট।" আমি আর দিরি করব। আমার কাছে তখন ২০৳ টাকাই অবশিষ্ট ছিল। এদিকে আমাদের আবার এই স্টেশনে নামতেই হবে। তাই ২০ টাকা দিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম।

তারপর পানাকাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমার পানাকাটি বাহের চর গ্রাম। শিকারপুর হতে যার দূরত্ব মাত্র ১ মাইল। আমি হাটছি আর মনে মনে বলছি, 'পরিচিত কোন লোকের দেখা যেন না পাই।' কিন্তু তাই ঘটলো দেখলাম সামনে আমার পরিচিত একটা

লোক। উনি আমার দিকেই আসছেন। সম্ভবত শিকারপুরে যাচ্ছেন কোন কাজে। আমি মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। তারপর উনার সামনে দিয়ে মাথা নত ক করে চলে যেতে লাগলাম। কিন্তু তবুও আমাকে উনি চিনতে পারলেন। চিনতে পেরেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর উনার সমস্ত কাজ বন্ধ দিয়ে আমাদের বাড়ি নিয়ে চললেন।

নানা বাড়ির কাছে যেতে যেতেই নানি আর খালাম্মারা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। নানা বেঁচে ছিলেন না। তিনি পাঁচ বছর আগে নিউমোনিয়ায় পরলোকগমন করেছেন। নানি আর

খালাম্মারা যখন আমাকে বসিয়ে দিয়ে- ছিলেন তখন আমার কি অবস্থা হয়েছিল, তা তো আপনারাই অনুভব করতে পারছেন। তারপর উনারা কান্না থামিয়ে আমাকে নিয়ে চললেন বাড়ীর ভিতরে। বাড়ীর উঠোন ছিলো অনেক বড়ো। আমাকে দেখার জন্য এত লোক যোগাড় হয়েছিল যে, উঠোন ও তাদের জায়গা করে দিতে পারলো না। আমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে একটা খাটে শুইয়ে দেওয়া হলো। অনেকদিন এই রকম খাটে শুইনি। তাই শোয়ার সাথে সাথেই খুবই আরাম বোধ করতে লাগলাম। সেদিনটা কেটে গেল খাটে শুয়ে শুয়েই। মাঝে

শুধু খাবার দেওয়া হতো। তাও খাটে বসে খেতে হতো। কেউ আমাকে খাট থেকে উঠতে দিতে চাইতো না। দুপুর বেলা শুধু একবার উঠতে পেরেছিলাম গোসল করার জন্য। গোসল করার পর আবার বিছানায় শুতে হলো।

দুই দিন পর বাবা খবর পেয়ে পাশা বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার একদিন পর ওনার সাথে মাগুরায় চলে এলাম। আমাকে প্রথম দেখে মা একটা কথাও বলতে পারলেন না। এমনকি একটু কাঁদলেনও না। শোকে দুঃখে হয়তো তিনি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষন পর আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন। তখন প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে আর দেশ ভ্রমনে যেতে হবে না।

পরের দিন স্কুলের পোষাক পরে বই-খাতা নিয়ে স্কুলে উপস্থিত হলাম। সহপাঠীরা প্রথমে আমাকে দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। বিভিন্ন পিরিয়ডে এক এক জন স্যার আসতে লাগলেন আর আমার ভ্রমন কাহিনী শুনতে লাগলেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই আমার ভ্রমন কাহিনী ওনাদের কাছে বললাম। এমনি ভাবে কেটে যেতে লাগল

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কথা বলতে বলতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেল। তবুও স্যারেরা আমাকে ছাড়লেন না। এক সময় ক্লাস ছুটির ঘন্টা বেজে উঠলো। তখন ওনাদের হাত থেকে আমি রক্ষা পেলাম।

পরের দিন আমাদের স্কুলের কৃষি চর্চা বিষয়ক আকবর স্যার ওনার কৃষির চর্চা পিরিয়ডে ছাত্র দের সামনে আমার ভ্রমন কাহিনী বলতে বললেন। আমি এক রকম ভয়ে ভয়েই ওই সবার সামনে উপ-

লিত হলাম। তারপর কয়েকবার চোখ দিলে আমার কাহিনী বলা শেষ করলাম।

আমি আর লিখতে পারছি না এজন্য আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আগে যদি জানতাম লেখার এত কষ্ট তাহলে এ পথে আর পা বাড়াতাম না। আপনাদের সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি।

— মো: মনিরুজ্জামান
(মনির)

২৭-৮-৯১

* সমাপ্ত *